মাটির মূর্তি

লেখক

শ্রীরামবৃক্ষ বেণীপুরী

অনুবাদিকা

শ্রীমায়া গুপ্ত

সাহিত্য অকাদেমী

নিউ দিল্লী

সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

1958

প্রকাশক : সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড,

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মূল্য : ২ ৫০

বেণীপুরী

বেণীপুরী নামটি বহু ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। বেণীপুরী শিশুসাহিত্য গড়ে তুলেছেন, বেণীপুরী স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠতা, ত্যাগ তপস্যার দ্বারা সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতীক ও যুব সম্প্রদায়ের আদর্শ। বেণীপুরী ভারতীয় সমাজবাদী দলের সদস্য, সাহিত্য ক্ষেত্রে বেণীপুরী কত বিভিন্ন বিচার ও আন্দোলনের সঙ্কেত দিয়েছেন। আজ বহু বৎসর পরে সেগুলি অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি একজন সুরসিক নাট্যকার এবং অসাধারণ শব্দশিল্পী, সারা ভারতে তাঁর রচিত স্কেচগুলি সমাদৃত। এত গুণ একত্রে সম্মিলিত হয়েছে বেণীপুরীর মধ্যে। অথচ সবক্ষেত্রেই সেগুলি আকর্ষক ও খাটি।

নিজের একটি পুস্তকের ভূমিকায় বেণীপুরী লিখেছেন: 'যার হাতে মস্তিষ্ক ও অঙ্গুলিতে চোখ আছে।' ভাষা ও বিচারধারা যখন বেণীপুরীর টেঁকশাল হতে ছাঁচে ঢালা হয়ে বাহির হয় তখন তা এমনই প্রাণবন্ত ও সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে। বেণীপুরী যেন সাহিত্যের মুখে জিহ্বার সৃজন করেছেন।

স্বপ্ন তাঁর লেখনীতে সজীব হয়ে চলাফেরা করে, বিচার ও যুক্তি তীরের মত লক্ষ্য বিদ্ধ করে, নবপ্রস্ফুটিত ফুলের উদ্ভাস, শিশিরের মনোহারিতা যেন তাঁর হাতে আরও উদ্ভাসিত আরও মনোহারী হয়ে ওঠে, প্রকৃতির সজীবতা আরও সজীব হয়ে ওঠে—এই কেরামতি বেণীপুরীর ভাষার।

শ্রীরামবৃক্ষ বেণীপুরী বিহার রাজ্যের অধিবাসী। নিজে তিনি বহু পত্র পত্রিকার স্রষ্টা, সেগুলির মধ্যে কিছু এখনও প্রকাশিত হয়, বাকীগুলি আমাদের দেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার মতই সমাপ্ত হয়ে গেছে।

প্রথমে তিনি শিশুসাহিত্য লিখে জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, জীবনচরিত ও রাজনৈতিক বিচার বিশ্লেষণও লিখেছেন। তার পরে নাট্যকার রূপে পরিচিত হয়েছেন এবং সাফল্যও লাভ করেছেন। হিন্দী সাহিত্যে বিশিষ্ট শৈলীকার বলে তিনি সমাদর লাভ করেছেন। তাঁর এই বিশিষ্ট প্রতিভার বিকাশ 'মাটির মূর্তি' বইখানিতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। আজ ভারতের সমস্ত প্রমুখ ভাষায় এই বইখানির অনুবাদ হচ্ছে এ খুবই আনন্দের কথা। এজন্য সাহিত্য অকাদেমীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রামধারী সিংহ 'দিনকর'

পাটনা
১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

এই সব মাটির মূর্তি

গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে নিশ্চয় কোন বট বা অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঁধান বেদীর ওপর কিছু মূর্তি আপনার নজরে পড়েছে, মাটির মূর্তি!

এই মূর্তিগুলোয় না আছে রূপ, না রঙ। বাস্তবিক বৌদ্ধ যুগের বা গ্রীক মূর্তিকলার মর্যাদাই আমরা দিতে অভ্যস্ত, এই মাটির মূর্তিগুলো দেখে যদি আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই বা নাসিকা উত্তোলন করে ফেলি—তা হলে আশ্চর্যের কথা কিছুই নেই।

কিন্তু এই অসুন্দর মূর্তিগুলোর মধ্যে যে বস্তু আছে তা খুঁজে দেখার কথা আমাদের মনেই হয় না। এ বস্তুটির নাম প্রাণ। এরা মাটির তৈরি, মাটির ওপরই এদের স্থান তাই এরা জীবনের খুব কাছে। জীবন শক্তিতে ওতপ্রোত। এরা চোখে দেখে, কানে শোনে, এরা তুষ্ট হয় অসন্তুষ্ট হয়, অভিশাপ দেয় আবার আশীর্বাদও দেয়।

এ মূর্তি স্বর্গের দেবতাদের নয় বা কোন অবতারেরও নয়। গ্রামের কোন সাধারণ মানুষ, কোন মাটির পুতুল—কোন অসাধারণ অলৌকিক কাজ করে একদিন দেবত্ব লাভ করেছে। তার স্থান তখন হয় দেবতাদের মধ্যে—গ্রামের প্রতিটি মানুষের সুখ ও দুঃখের দ্রষ্টা এবং স্রষ্টায় পরিণত হয় সে।

মাটির এই পুতুলগুলিই এই মাটির মূর্তি। তারা দেখে শোনে, খুশি হয় অখুশি হয়। সন্তান লাভ হলে, ভাল ফসল পেলে, যাত্রা শুভ হলে, মকদ্দমায় জয়লাভ হলে এরা আনন্দিত হয়। আবার রোগে, মহামারীতে, হিমপাতে ফসল নষ্ট হলে, ঘরে আগুন লাগলে এরা নিরানন্দ হয়।

এরা যে জীবনের অতি নিকটে আছে কেবল তাই নয়, এরা জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট। সেইজন্য জীবনের যারা পূজারী তাদের শির এদের সামনে স্বতঃই নত হয়ে যায়। বৌদ্ধ, গ্রীক, রোমক মূর্তিগুলি দ্রষ্টব্য প্রশংসনীয় নিশ্চয় কিন্তু মাটির এই মূর্তিগুলিও উপেক্ষার বস্তু নয়, এক্ষেত্রে এইটুকুই আমার নিবেদন।

* * *

আপনারা রাজরাণীদের কাহিনী পড়েছেন, সাধু সন্তদের বাণী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেছেন, নেতা নায়কদের জীবনী অধ্যয়ন করেছেন। কাহিনী, বাণী, জীবনী মনোরঞ্জন করেছে, হৃদয়ে উৎসাহ এনেছে। সত্যই এগুলি অধ্যয়ন, মনন নিদিধ্যাসনের বস্তু।

কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে আপনার গ্রামেও এমন অনেক মানুষ থাকে যাদের কাহিনী ও জীবনী রাজারাণী, সাধুসন্ত, নেতা নায়কদের কাহিনী বা জীবনচরিত অপেক্ষা কম মধুর, কম উজ্জ্বল নয়। শকুন্তলা, বশিষ্ঠ, শিবাজী এবং নেতাজীর ভক্তবৃন্দদের নিজের গ্রামে বুধিয়া, বালগোবিন ভগত, বলদেব সিংহ এবং 'দেব'দের চেনবার জানবার অবসর কোথায়?

হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে নির্জন জীবন যাপনের সময় একবার আমার নিজের গ্রাম আর মামার বাড়ীর গ্রামের কতকগুলি বিশিষ্ট মানুষের চেহারা মনে পড়ত, মনে হত যেন লেখনীর মাধ্যমে তারা চিত্রিত হতে চায়। তারই ফলে এই মাটির মূর্তি রচিত হয়েছে। জেলে থাকার ফলে বৈজু মামার চিত্রও এদের পংক্তিভুক্ত হয়েছে।

সত্যই এগুলি কাহিনী নয়, এগুলি জীবনচরিত—চলাফেরা মানুষদের কথাচিত্র। অবশ্য এগুলির ওপরে শিল্পের রঙ চঙ আছে কিন্তু রঙে রঙে মূল রেখাগুলোকে ঢাকা পড়তে আমি দিই নি। যে রাঁধুনী মসলার

প্রাচুর্যে তরকারীর আসল স্বাদটি নষ্ট করে ফেলে আমি তার প্রশংসা করি না।

শিল্পের কাজ জীবনকে গুপ্ত রাখা নয়, তাকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত করা। শিল্প জীবনকে আরও স্পষ্ট আরও উজ্জ্বল করে তুলে ধরে।

আমার চিন্তা ছিল এ যুগে আমার এই মাটির মূর্তি পাঠকের কাছে কতটা শ্রদ্ধা লাভ করবে? কিন্তু হিন্দী জগৎ এই রচনাটি লুফে নিয়েছে। এ আমার কলম বা শিল্পের কারসাজি নয়। মানুষের মনে মাটির প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এ তারই পরিণাম। সেই স্নেহের সম্মুখে আমি বারবার মাথা নত করি এবং আরও কিছু এমনই মাটির মূর্তি হিন্দী জগতের সেবায় উৎসর্গ করবার সৌভাগ্য কামনা করি।

দীপাবলী, ১৯৪৬

শ্রীরামবৃক্ষ বেণীপুরী

নবীন সংস্করণ

'মাটির মূর্তি' সোনার মূর্তি রূপে প্রমাণিত হয়েছে। ছ বৎসরে ষাট হাজার বই বিক্রয় হয়েছে। এই নবীন সংস্করণে আর একটি মূর্তি সংযোগ করা হল, সেটি রাজিয়ার মূর্তি। পূর্বাপর ক্রম কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, পাঠও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। সমস্ত রচনাটি চিত্র সংবলিত করা হয়েছে। আশা করি নবরূপে পুস্তকটি আরও আদৃত হবে।

গঙ্গা দশহরা, ১৯৫৩

শ্রীরামবৃক্ষ বেণীপুরী

সূচীপত্র

রাজিয়া

কানে রূপোর রিং, গলায় রূপোর হাঁসুলী, হাতে রূপোর কঙ্কণ ও পায়ে রূপোর গোঁড়াঙ্গ[১], পুরোহাতা বুটিদার জামা, কালো রঙের সাড়ীর আঁচল গলায় জড়ান। ফরসা মুখে উড়ে পড়া চুলগুলো সামলাতে ব্যস্ত ছোট মেয়েটি সেদিন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ সম্প্রতি তাদের গ্রামে গিয়ে শৈশবের সেদিনকার রাজিয়ার স্মৃতি আবার নতুন করে জেগে উঠল।

আমার ছেলেবেলার কথা। কসাইখানা থেকে দড়িছেঁড়া বাছুরের মত স্কুলের ছুটির পর আমি বাড়ী ফিরেছি। বইয়ের ব্যাগ শ্লেট বারাণ্ডার তক্তাপোষের ওপর ফেলে মাসির দেওয়া ছটের[২] প্রসাদী ঠেকুয়া[৩] নিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছি আর ঢেঁকীর ওপর দোল খাচ্ছি এমন সময় শুনলাম :

'খোকাবাবুর খাবার যেন ছুঁয়ে দিস না।' সেই সঙ্গে দেখলাম এই অপরূপ রঙ ঢঙ-এর মেয়েটিকে—আমার কাছ হতে দু তিন গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সত্যই তার রূপ ও সাজসজ্জা আমার চোখে অদ্ভুত ঠেকেছিল। গোঁড়া হিন্দু পাড়ায় আমার বাস, হাট বাজার বা মেলায় যাওয়া আমার নিষিদ্ধ ছিল। শুনেছিলাম কবে নাকি আমি একবার মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলাম, আমায় কোন এক কাপালিক সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল,

১ পায়ের মোটা অলঙ্কার, বিহারে ব্যবহৃত হয়।

২ ছটপর্ব কার্তিকের একটি বিশেষ পর্ব। সূর্য পুজা করা হয়।

৩ ঠেকুয়া আটা চিনি মেখে নানা আকারের ছাঁচে ভাজা পিঠে, ছট পুজোর বিশেষ প্রসাদ।

গ্রামের কোন এক মেয়ের নজর পড়ায় নাকি আমার উদ্ধার হয়েছিল। আমি ছিলাম মা বাপের একমাত্র সন্তান—মা মারা গেছেন তাই তাঁর এই একমাত্র গচ্ছিত ধনটিকে মাসী চোখে চোখে আগলে রাখত।

আমাদের গ্রামেও মেয়েদের সংখ্যা কম নয় কিন্তু তাদের এমন সাজসজ্জাও নয় আর রূপও নয়। আমাদের গ্রামের মেয়েরা কানে রিং পরত না এবং পুরোহাত জামাও তাদের কখনও পরতে দেখি নি। গৌর বর্ণ অবশ্য দেখেছি কিন্তু এই মেয়েটির চোখে ছিল এক বিচিত্র নীলিমা—তা আমাদের গ্রামে দুর্লভ। তা ছাড়া মুখখানার গড়ন অপরূপ, তাই আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

কণ্ঠস্বর ছিল রাজিয়ার মায়ের। তাকে প্রায়ই ঝুড়ি ভর্তি চুড়ী নিয়ে গ্রামে আসতে দেখতাম। সে আমাদের উঠোনে চুড়ীর বাজার সাজিয়ে বসেছিলো, তাকে ঘিরে গ্রামের অনেক কন্যা ও বধূ। মুখে দর-দামের কথা বলছে আর হাত দিয়ে ক্রেতাদের হাতে চুড়ী পরাচ্ছে। এতদিন অবধি তাকে একা যেতে আসতে দেখেছিলাম, অবশ্য কখন কখনও তার পেছনে চুড়ীর ঝুড়ি মাথায় নিয়ে কোন পুরুষ মানুষকেও দেখা যেত। এই মেয়েটি সেদিন প্রথমবার এসেছিল, আর কে জানে কি এক বালসুলভ ঔৎসুক্য তাকে আমার কাছে টেনে এনেছিল। বোধ হয় এ কথা তার জানাও ছিল না যে কারো হাতের খাবার অপর একজন কাছে গেলেও ছোঁয়া যায়। তার মা যখন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, তার গতি কুণ্ঠিত হয়ে গেল, তার পা দুখানা যেন সেইখানেই গেঁথে গেল, কিন্তু তার সেই স্তব্ধ হয়ে যাওয়া যেন তাকে আমার অতি নিকটে এনে দিল।

মাসী চট করে উঠে ঘরের মধ্যে থেকে দুখানা ঠেকুয়া আর একখানা

কসার[৪] তার হাতে দিল। সে প্রথমে নিচ্ছিল না পরে মায়ের বলা কওয়ায় হাতে নিল কিন্তু মুখে দিল না।

আমি বললাম: 'খাও না। তোমাদের বাড়ীতে এ সব হয় না? ছুট হয় না?'

এমন সব প্রশ্ন। তার উত্তরে সে কেবল মাথা নেড়ে না বলে গেল। মাথা নাড়তে গিয়ে মুখের ওপর এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলো সামলাতে সে বিপন্ন হয়ে পড়ল।

যখন তার মা নতুন ক্রেতার সন্ধানে আমাদের উঠোন থেকে উঠল, রাজিয়াও তার পেছনে পেছনে চলতে লাগল। আমি ততক্ষণে খাওয়া, মুখ ধোওয়া সেরে তার কাছে এসে গিয়েছিলাম। সে যেতে আমাকেও যেন তার সঙ্গে খানিক দূর টেনে নিয়ে গেল। আমার ভাব দেখেই বোধহয় চুড়ীওয়ালীর মুখে হাসির অজস্র তরঙ্গ উঠল। সে দুষ্টুমী করে বলল: 'কি খোকাবাবু, রাজিয়াকে বিয়ে করবে?'

তারপর মেয়ের দিকে ফিরে বলল: 'কি রাজিয়া, এ বর তোর পছন্দ হয়?'

তার কথা শুনেই আমি এক দৌড়ে পালালাম। বিয়ে… এক মুসলমান মেয়ের সঙ্গে! খানিক দূর গিয়ে পেছন ফিরে দেখলাম রাজিয়ার মা খুব হাসছে আর রাজিয়া মায়ের কোমর জড়িয়ে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে।

* * *

রাজিয়া চুড়ীওয়ালী। সে এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিল। শৈশব তার কেটেছে এই গ্রামে, যৌবনও, কারণ মুসলমানদের বিবাহ গ্রামেই

---

৪ কসার—ঠেকুয়ার মত তবে তাতে বাদাম, নারকোল, কিসমিস ইত্যাদি দেওয়া থাকে।

হয়ে যায়। ভালই হয়েছিল, কারণ বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রামেই তার সাথে দেখা হয়ে যেত।

পড়াশোনা করে আমি বড় হলাম, তারপর বড় হয়ে সহরে পড়তে যেতে হল। কেবল ছুটীছাটায় বাড়ী আসা। পড়াশোনা রাজিয়ার হল না বটে তবে বড় সে ঠিকই হতে লাগল। কিছুকাল নিজের মায়ের পেছনে পেছনে ঘুরল। মাথায় ঝুড়ি ওঠেনি বটে কিন্তু হাতে চুড়ী পরাবার কৌশল ঠিকই আয়ত্ত করেছে। নতুন বৌরা বলত তার হাত নাকি খুব মোলায়েম, রাজিয়ার হাতে চুড়ী পরাই তাদের পছন্দ। মাও বেশ প্রসন্ন কন্যার ওপর—রাজিয়া চুড়ী পরাত আর সে নতুন নতুন খরিদ্দার ধরত।

রাজিয়া বড় হতে লাগল। যখনই দেখা হত, নজরে পড়ত তার নব রূপে বিকশিত দেহ। শুধু দেহ নয় প্রকৃতিতেও পরিবর্তন হল। প্রথম দেখার পর হতে তাকে দেখেছি প্রগলভ, আমায় দেখেই দৌড়ে কাছে আসত, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। অদ্ভুত অসংলগ্ন প্রশ্ন।

'দেখুন তো এই নতুন কানের রিংগুলো আপনার পছন্দ হয়? সহুরে মেয়েরা এমন রিং পরে?···মা সহর থেকে চুড়ী নিয়ে আসে। এবার যখন যাবে আমাকেও নিয়ে যাবে সহরে—মাকে বলে রেখেছি। আপনি সহরে কোথায় থাকেন··· গেলে দেখা হবে?···'

সে এমনই কত বকবক করে যেত—আমি শুনতাম। বোধহয় তার কাছে এসবের উত্তরের প্রয়োজন ছিল না।

এর কিছু দিন পরে মনে হল তার মধ্যে যেন কিছু সঙ্কোচের ভাব এসেছে। আমার কাছে আসবার সময় সে এদিক ওদিক দেখে নিত, আর কথা বলবার সময় এমন সাবধান থাকত যেন কেউ দেখে বা শুনে

না ফেলে। একদিন যখন সে এমনই কথাবার্তা বলছে আমার বৌদি বলল : 'দেখিস রাজিয়া, যেন আমাদের ছেলেকে ভুলিয়ে নিস্ না।'

কথা শুনে বৌদির দিকে চেয়ে সে হেসে উঠল, দেখলাম তার গাল দুটো লাল হয়ে গেছে, আর তার নীল চোখ দুটির কোণ তরল হয়ে উঠেছে। আমার মনে হল আমাদের যখনই কোথাও দেখা হয়, অনেক জোড়া চোখ যেন বর্শার ফলার মত আমাদের দিকে লক্ষ্য করে থাকে।

রাজিয়া বড় হতে লাগল, বালিকা হতে কিশোরী হল, যৌবনের ফুলও ক্রমে ফুটে উঠল তার দেহে। তখনও সে মায়ের সঙ্গেই আসত। কিন্তু প্রথমে সে ছিল তার মায়ের ছায়ামাত্র, ক্রমে ক্রমে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হল এবং তার ছায়ামাত্র হবার জন্য কত না হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে যখন বোনদের চুড়ী পরাত কত যে ভাই মজা দেখতে সেখানে জমা হত! কেন? ভগ্নী বাৎসল্য, না রাজিয়ার প্রতি এক অজ্ঞাত আকর্ষণ? বধূদের হাতে যখন সে চুড়ী পরাতে থাকে তাদের পতিদেবরা দূরে দাঁড়িয়ে আড়চোখে কাকে দেখতে থাকে। নবোঢ়া পত্নীর কোমল হাত দুখানি, না সেই হাতের ওপর রাজিয়ার নিপুণ সূক্ষ্ম আঙ্গুলগুলির খেলা! রাজিয়ারও যেন এতে বিশেষ রুচি আছে বলে মনে হয়। পতিদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতেও সে ছাড়ে না। বলে :

'বাবু, চুড়ী খুব মিহি, দেখবেন যেন মট করে ভেঙ্গে না যায়।'

শুনে পতিদেবরা পলায়ন করেন, বধূরা খিলখিল করে হাসতে থাকে। রাজিয়া হা-হা করে হাসে। নিজের কাজে বেশ নিপুণ হয় সে।

চুড়ীওয়ালীর কাজ কেবল রঙ বেরঙের চুড়ী, সস্তা টেঁকসই নতুন নতুন ফ্যাশানের চুড়ী নিয়েই নয়—চুড়ীর সঙ্গে তার নিজের সাজ-পোষাক, রূপসজ্জা, সরস চটুল কথাবার্তা এগুলোও তার ব্যবসার জন্য

বিশেষ দরকার। কেবল চুড়ী পরবার মানুষটিকেই নয়, সেই সঙ্গে যাদের পয়সা দিয়ে চুড়ী কেনা হয় তাদেরও মুগ্ধ করতে পারা চুড়ী-ওয়ালীর কাজ। এককালে রাজিয়ার মা কি কিছু কম ছিল! ভগ্নাবশেষ দেখেই বোঝা যায় একদিন ইমারত কত চটকদার ছিল।

সহরে বেশীর ভাগ থাকার দরুণ রাজিয়ার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ দুর্লভ হয়ে পড়ল। অনেকদিন পরে একদিন তাকে চুড়ী নিয়ে আমাদের গ্রামে আসতে দেখলাম—দেখি, তার পেছনে চুড়ীর ডালা নিয়ে এক নবযুবক। আমায় দেখেই সে যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল, অনুমানে বুঝলাম লোকটি তার স্বামী। তবুও না জানার ভান করে বললাম: 'এ মজুরটিকে কোথা হতে ধরে আনলি রে?'

'একেই জিজ্ঞাসা করুন—সঙ্গে রয়ে গেল, কি আর করি।'

নবযুবক মুচ্‌কি হাসল, রাজিয়াও হাসল, বলল: 'এ আমার স্বামী, হুজুর।'

স্বামী! শৈশবে সেই প্রথম দেখা হওয়ায় তার মা ঠাট্টা করে যা বলেছিল কে জানে তা মনের কোন গহনে সুপ্ত হয়ে ছিল, হঠাৎ যেন জেগে উঠল। সেদিন নিশ্চয় আমার কপালে আশাভঙ্গের সঙ্কুচন দেখা দিয়েছিল।

তারপর একদিন এল, যেদিন আমিও স্বামী হলাম। আমার রাণীর সোহাগের চুড়ী পরাতে সেদিন রাজিয়া এল আর আমার উঠোনে কত যে হাসি তামাসা করল তার আর সীমা নেই। 'এ নেব, তা নেব, যা চাইব তা না পেলেই এমন জিনিষটি নেব যে নতুন বৌ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে।'

'যা যা। তুই আমাদের বাড়ীর বরকে নিয়ে যাবি তো তোর হাসান কি করবে শুনি?'—আমার বৌদি বলল।

'সেও ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকবে বৌদি,' রাজিয়া এই বলে খুব হাসতে হাসতে হাসানকে গিয়ে জড়িয়ে ধরল, বলল তাকে : 'কিছু যেন মনে কর না।'

হাসানও হেসে উঠল। রাজিয়া নিজের প্রেমের কাহিনী শোনাতে লাগল। কেমন করে হাসান তার সঙ্গ নিয়েছিল, তারপর কত ঝঞ্ঝাট হল, তারপর হল বিয়ে। এখনও সে ছায়ার মত রাজিয়ার পেছনে বেড়ায়—কি জানি মনে তার কি ভয়!

তারপর আমার রাণীর হাত ধরে বলল : 'হুজুরও যেন তোমার পেছনে এমনই ছায়ার মত থাকেন নতুন বৌরাণী।'

সমস্ত অঙ্গনে হাসির রোল উঠল। আমার মনে হল সেই হাসিতে রাজিয়ার কানের রিংগুলো যেন অদ্ভুতভাবে ঝকমক করতে লাগল।

জীবনের রথ উবড়ো খাবড়া পথে এগিয়ে যেতে লাগল—আমার এবং রাজিয়ারও। অনেকদিন পরে পাটনায় হঠাৎ দেখা হওয়ায় তার খবর পেলাম। হঠাৎ দেখা হল, কিন্তু 'দেখা হল' বলা যায় কি?

এ সময়টা আমি বেশীর ভাগই বাড়ী থেকে দূরে থাকতাম। যদি কখনও এক আধ দিনের জন্য বাড়ী যেতামও তাহলে সন্ধ্যায় গিয়ে সকালে ফিরতাম। অনেক রকম দায়িত্ব, নানান ঝঞ্ঝাট। তখন আমি থাকি পাটনায়. পাটনা সিটিতে একখানা ছোট পত্রিকার তখন আমি 'পীর—বাবুর্চি—ভিস্তি' একাধারে সব অর্থাৎ সবেধন নীলমণি। অবশ্য লোকে আমায় সম্পাদক বলেই জানত। তখনকার দিনে না ছিল এত পত্র-পত্রিকা, আর না ছিল এত সম্পাদক—তাই আমার বেশ কদর ছিল, যখনই দপ্তর থেকে বার হতাম, দেখতাম—লোকে আমার দিকে দেখিয়ে

বেশ একটা ভক্তির ভাব সহকারে ফিসফাস করে কথা বলে। আমার প্রতি লোকেদের এপ্রকার নিষ্ঠার ফলস্বরূপ আমাকেও সতত নিজের পদমর্য্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হত।

একদিন আমি চৌরাস্তার এক প্রসিদ্ধ পানওয়ালার দোকানে পান খাচ্ছি। আমার সঙ্গে আমার ভক্ত দুচার জন নবযুবক ছিল, দু এক জন বয়োজ্যেষ্ঠও সেখানে পৌছেছেন। পান খেতে খেতে কিছু রসিকতাও চলছে এমন সময় একটা ছেলে এসে আমায় বলল: 'ঐ স্ত্রীলোকটি আপনাকে ডাকছে।'

স্ত্রীলোক ডাকছে—চৌরাস্তার ওপর! আমি তো চমকে উঠলাম। যুবকদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য—বয়স্কদের মুখে এক রহস্যময় মুচকি হাসিও আমার চোখে লুকোন রইল না। স্ত্রীলোক? কে? আমার রাগ হয়ে গেল, ছেলেটা হকচকিয়ে পালাল।

পান খেয়ে যখন লোকেরা এদিক ওদিক চলে গেল, আমার পা দুখানা যেন স্বতঃচালিত হয়ে সেই ছেলেটি যেদিকে ইসারা করেছিল সেই দিকে অগ্রসর হতে লাগল। কিছুদূর এগিয়ে পেছন ফিরে দেখে নিলাম, পরিচিত কেউ দেখছে না তো। চৌমাথার এই সান্ধ্য রোমাণ্টিক আবহাওয়ায় কারো অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর কোথায়? আমি এগিয়ে অশ্বত্থ গাছের পূর্বদিকে পৌছলাম। যেতেই গাছের তলায় বেদীর কাছ হতে একটি স্ত্রীলোককে আমার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। কাছে এসে সে বলল: 'সেলাম হুজুর।'

ধক করে উঠল বুকটা। সে মাথা তুলতেই তার কানের রিংগুলো ঝকঝক করে উঠল—তাকে চিনতে আর বিলম্ব হল না।

'রাজিয়া এখানে কেমন করে?'—আমি বলে ফেললাম।

'কেনা কাটা করতে এসেছি হুজুর—এখন লোকের রুচি বদলে গেছে

কি না। এখন আর গালার চুড়ী কে পছন্দ করবে? নতুন নতুন মানুষ, নতুন ফ্যাশানের চুড়ী। সাজবার আরও কিছু জিনিষপত্রও নিয়ে যাই, এই পাউডার ক্লিপ এমনি সব অনেক কিছু। এখন নতুন যুগ এসেছে, নতুন বৌদের নতুন রকমের মন মেজাজ···।'

একটু থেমে বলল: 'শুনেছিলাম আপনি এইখানেই থাকেন। কোথায় থাকেন হুজুর?···আমি তো প্রায়ই আসি যাই···'

ভাবছি জিজ্ঞাসা করি, একা এসেছে কি না। এরই মধ্যে এক প্রৌঢ় গোছের লোক এসে সেলাম করল। এই হাসান। দীর্ঘ দাড়ী, পাঁচ হাত লম্বা বলিষ্ঠ পুরুষ।

'দেখুন হুজুর, এখনও ও আমার সঙ্গ ছাড়ে না'—বলে রাজিয়া হেসে উঠল। রাজিয়া আর সে রাজিয়া নেই কিন্তু তার হাসিটুকু সেইই আছে। সেই হাসি-ঠাট্টা। এদিক ওদিক অনেক কথাবার্তা হল। হয়ত আরও কতক্ষণ এমনই চলত যদি আমার খেয়াল না হত কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছি আর আমি কে? যদি কেউ দেখে ফেলে, তাহলে?

কিন্তু সে ছাড়ে তবে তো! যখন আমি যাবার জন্য উঠছি, সে হাসানকে বলল: 'দেখছ কি দাঁড়িয়ে, হুজুরকে পান তো খাওয়াও। কতবার গোগ্রাসে কুঁচকী কণ্ঠায় গিলেছো বাবুর বাড়ীতে।'

হাসান যখন পান আনতে গেল, রাজিয়া বলতে লাগল—সংসারে কত পরিবর্তনই না হয়েছে। এখন এমন অনেক গ্রামে হয়েছে যে—হিন্দুরা মুসলমানদের কাছ হতে জিনিষপত্র কেনেই না। এখন হিন্দু চুড়ীওয়ালী, হিন্দু দরদী হয়েছে। রাজিয়ার মত জাত ব্যবসায়ীদের এতে খুবই লোকসান হয়েছে। কিন্তু রাজিয়া সুখবর দিল যে আমাদের গ্রামে এমন পাগলামী হয় নি। আর আমার রানী তো রাজিয়া ছাড়া আর অপর কারো হাতে চুড়ী পরেই না।

হাসানের আনা পান খেয়ে যখন আমি যাবার জন্য তৈরি হলাম সে জিজ্ঞাসা করল আমার বাসা কোথায়। আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে।

'ভয় নেই হুজুর আমি একা যাব না···ও সঙ্গে থাকবে—কি বল?' বলে সে হাসানের কাছে ঘেঁসে তাকে জড়িয়ে দাঁড়াল।

'পাগলী কোথাকার, এ হল সহর'—হাসান হাসতে হাসতে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। বলল:

'হুজুর, ছেলেপুলের মা হয়েছে কিন্তু ওর ছেলেমানুষি এখনও গেল না।'

পরদিন দেখি রাজিয়া আমার বাসায় এসে উপস্থিত। 'হুজুর, রাণীর জন্য এই চুড়ীগুলো এনেছি'—বলে আমার হাতে কতকগুলো চুড়ী দিল। আমি বললাম: 'তুমি তো আমাদের বাড়ী যাও—তাকে নিজের হাতেই পরিয়ে দিও।'

'না হুজুর, একবার নিজের হাতেই তাকে পরিয়ে দেখুন' বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

আর আমি যখন বললাম '—এ বয়সে আর···'

সে হাসানের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল: 'একে জিজ্ঞাসা করুন, আজ পর্যন্ত ও আমার হাতে চুড়ী পরায় কি না'—হাসানকে লজ্জিত হতে দেখে বলল: 'ও একটি ঘাঘি, কেমন মুখ করেছে দেখুন। কিন্তু যখন হাত ধরে······' বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সজোরে হেসে উঠল। আমি ভীত হয়ে চারিদিকে দেখে নিলাম কেউ না দেখে শুনে ফেলে।

*   *   *

হাঁ, সেদিন হঠাৎ তাদের গ্রামে গিয়ে পড়লাম। ইলেকশনের ধাক্কা কোন্ আঘাটায় যে নিয়ে না যায়! নাকে পেট্রোলের ধোঁয়ার গন্ধ, কানে গাড়ির সাঁ সাঁ শব্দ, সর্বাঙ্গ ধুলোয় ভরা, হয়রান ওষ্ঠাগতপ্রাণ,

কিন্তু সেই গ্রামে আমার জিপখানা ঢুকতেই আমার মনে এক বিশেষ ভাবের উদয় হল।

রাজিয়ার গ্রাম—এখানেই তো সে থাকত। কিন্তু আজ কি একথা কাউকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভব যে—এ গ্রামের রাজিয়া চুড়ীওয়ালী ছিল, সে কি এখনও আছে? হাসানের নাম করতেও কেমন যেন কুণ্ঠা হল। আমি এখানে একজন নেতা, চারিদিকে আমার জয়ধ্বনি হচ্ছে। কত লোক আমায় ঘিরে আছে। যার দরজায় গিয়ে পান খাব সে নিজেকে পরম ভাগ্যবান্ বলে মনে করবে। যার সঙ্গে দুটো কথা বলব সে নিজেই অপরের আলোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠবে। এ সময় আমার কিছু উচ্চগ্রামে থাকাই বুদ্ধির কাজ।

জিপ থেকে নেবে লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি—অর্থাৎ কল্পনার উচ্চ শিখরে দণ্ডায়মান্ হয়ে আগতপ্রায় স্বর্ণযুগের বাণী শোনাচ্ছি লোকেদের। কিন্তু মস্তিষ্কে যেন কতকগুলো গ্রন্থি জট পাকিয়ে গেছে। অভ্যস্ত জিহ্বা নিজের কাজ করে চলেছে আর অবচেতন মনে যেন একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন টানাপোড়েন বুনে চলেছে। দুটির মধ্যে যেন ভারসাম্য নেই অথচ এদের একটিকেও স্তব্ধ করা সম্ভব নয়।

এমন সময় দেখি—এ যে রাজিয়া আসছে! রাজিয়া, সেই ছোট্ট রাজিয়া—রাজিয়া কি আবার সেই ছোট্ট মেয়েটিতে পরিণত হয়েছে। কান ভর্তি সেই রূপোর রিং, গৌরবর্ণ, সেই নীল চোখ দুটি, সেই পুরো-হাতা জামা পরনে, ঠিক তেমনই অবাধ্য চুলের গোছা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে সে এগিয়ে আসছে। মাঝখানে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের ব্যবধান। আমি কি স্বপ্ন দেখছি, দিবাস্বপ্ন?…সে আসছে, ভিড় ঠেলে আমার কাছে এসে সেলাম করছে। আমার হাত ধরে বলছে: 'চলুন হুজুর আমাদের বাড়ী।'

আমি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছি, কিছুই যেন বোধগম্য হচ্ছে না। লোকেরা মুচকি হাসছে যেন নেতা মহাশয়ের সব রহস্যই ফাঁস হয়ে গেল। না, এ তো স্বপ্ন নয় · । শুনলাম কে যেন বলছে : 'মেয়েটা বড় চঞ্চল', আর একজন বলছে : 'ঠিক নিজের ঠাকুমার মত আর কি'। তৃতীয় ব্যক্তির কথা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। শুনলাম সে বলছে :

'এ রাজিয়ার নাতনী বাবু। বেচারীর বড অসুখ। আপনার কথা কত বলে, কত যে প্রশংসা করে বাবু। অবসর হলে একবার তাকে দেখে নিন, কে জানে বেচারী বাঁচে কি না······'

আমি রাজিয়ার উঠোনে দাঁড়িয়ে আছি। ছোট ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর, নেপাপোছা ঝকঝকে তকতকে উঠোন। সচ্ছল গৃহস্থ— মেহনত আর সততার পরিণাম। হাসান মারা গেছে, কিন্তু তার মত আরও তিনটি হাসানকে সে রেখে গেছে যে! বড় ছেলে কলকাতায় কাজ করে, মেজো করে জাতব্যবসা, ছোট সহরে পড়াশোনা করে। এই মেয়েটি তার বড় ছেলের মেয়ে। কথায় বলে 'ঠাকুদ্দার মাথা পায় নাতি, আর ঠাকুমার রূপ পায় নাতনী'। হুবহু রাজিয়া—দ্বিতীয় রাজিয়া। দ্বিতীয় রাজিয়া আমার আঙ্গুল ধরে উঠোন থেকে ডাকাডাকি করছে : 'ঠাকুমা, ঠাকুমা ঘর থেকে বেরিয়ে এস, দেখ মালিক দাদা এসেছে।'

কিন্তু রাজিয়া আর বাইরে আসে না। কেমন করে রোগ-মলিন বস্ত্রে আমার সামনে আসে!

রাজিয়া নিজের নাতনীকে পাঠিয়েছিল কিন্তু তার বিশ্বাস হয় নি যে হাওয়া-গাড়ী-করে আসা নেতা কষ্ট করে তার বাড়ী পর্য্যন্ত আসবে। আর যখন শুনল আমি আসছি তখন সে বৌদের বলল, কাপড়খানা বদলে দিতে···কতদ্দিন পরে মালিক বাবুর সঙ্গে দেখা!······

তার দুই পুত্রবধূ তাকে ধরে উঠোনে নিয়ে এল। রাজিয়া—আমার

সামনে দাঁড়িয়ে রাজিয়া। জীর্ণ শীর্ণ। কিন্তু যখন কাছে এসে 'হুজুর সেলাম' বলল তখন তার মুখ হতে মুহূর্তের জন্য মাকড়সার জালের মত বলিরেখাগুলো যেন লুপ্ত হয়ে গেল। তার মুখ, তার কোটরে বসে' যাওয়া নীল চোখ দুটি বিজলী বাতির মত ক্ষণিকে উদ্ভাসিত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার কানের রিংগুলো ঝক ঝক করে উঠল।

মনে মনে বললাম, দেখে চোখ সার্থক করে নাও, পবিত্র করে নাও। কালের ধোয়া পোঁছায় রজতশুভ্র চুলের গুচ্ছ হঠাৎ তার মুখের ওপর পড়ে চকচক করতে লাগল।

বলদেব সিংহ

কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত একদিন তাকে আমাদের মধ্যে এসে পড়তে দেখলাম—ঠিক তেমনই জ্যোতির্ময় উজ্জ্বল আলোকরশ্মি। আবার ঠিক নক্ষত্রের মতই স্বল্পক্ষণে নিজের দীপ্তি ছড়িয়ে দিয়ে, আমাদের চোখ ধাঁধিঁয়ে দিয়ে তাকে চিরদিনের মত নিভে যেতেও দেখলাম। যেদিন সে এসেছিল আমরা অবাক হয়েছিলাম—আর যেদিন সে চলে গেল আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

পৌষ মাসের ভোর। খামারে ধানের বোঝার স্তূপ। সেগুলো দেখাশোনা করবার জন্য যে ছোট্ট ঘরটা ছিল তার সামনে আগুন জ্বলছিল। ক্ষেতে, ধান মাড়ানির জন্যে নিকোন জায়গাটুকুর—চারদিকেই হালকা কুয়াশার পরদা। সে-পরদা ছিন্ন করে প্রবেশ-পথ করে নেওয়া প্রভাত-সূর্য্যের শিশু-কিরণরেখাগুলির পক্ষে সহজ হয়নি। শীত প্রচণ্ড, কনকনে হাওয়া যেন বুকের মধ্যে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে।

আগুনটাকে ঘিরে আমরা সবাই বসে, আগুনের শিখা আর ছিল না, লাল অঙ্গারগুলো শুধু জল্‌জ্বল্‌ করছে। অঙ্গার ছাইয়ে ঢেকে যায়, আমরাও আরো কাছাকাছি ঘেঁসে আসি, যেন সেগুলোকে বুকের মধ্যে রাখতে চাই। সব চুপচাপ। খামারের ঠিক মাঝখানে 'দৌনী'র[১] জন্য যে বাঁশটা পোঁতা, তার ধানের শিষ-গোঁজা ঝাঁকড়া মাথায় একটা কালো কুচ্‌কুচে পাখী বসে এক এক বার সেই নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবার বৃথা চেষ্টা করছে।

সেই সময় এক যুবক দূর থেকে আমার মামাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল—'প্রণাম কাকা'। আমাদের সকলের নজর পড়লো তার উপরে। হৃষ্টপুষ্ট তরুণ, সবে মাত্র গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। রং ফরসা, প্রভাতের সূর্য্য যেন তার ওপর সোনার জলে রেখা টেনে দিয়েছে। তার ডান হাতে লালরঙের লম্বা বাঁশের লাঠি। আর সে লাঠিরই বা কি বাহার! কাছাকাছি গাঁট, গরুর লেজের মত সরল, মোটা থেকে সরু হয়ে গেছে। তার বাঁ হাতে ঘটি—শৌচাদি করে ফিরছে। পরনে বাদামী রঙের মুটিয়া কাপড়ের লম্বা দেহাতী পাঞ্জাবী, তার মধ্যে দিয়েও সুগঠিত শরীরের সৌন্দর্য্য যেন পরিস্ফুট।

—'বলদেব যে, কবে এলে? কতদিন পরে তোমায় দেখলাম।··· পূব দেশে রোজগারপাতি কর—সুখে থাক বাবা—তবে আমাদের ভুলে যেয়ো না। বোধহয় দু বছর পরে এলে—' মামা এই সব জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। খুব নম্রভাবে সে ক্ষমা চেয়ে বল্লে:

'কাকা, ভাবছি এবার এখানেই থাকবো। দুনিয়া তো অনেক দেখলাম, কোথাও মন বসলো না। মামার বাড়ীতেও ভাল লাগে না। বাপ-ঠাকুর্দ্দার এই জমিটুকু যেন দড়ি বেঁধে এখানে টানতে থাকে। তাই

---

১ দৌনী—খামারের মাঝখানে বাঁশ পোঁতা—বিহারে ব্যবহৃত হিন্দী শব্দ।

এখানেই ঘর বাঁধতে এলাম। ঘর তৈরী করে মাকেও মামার বাড়ী থেকে এখানে নিয়ে আসবো। ভাবছি আপনাদের সেবা করে দিন কাটিয়ে দেবো।'

বলদেব সিংহ এখানেই বসবাস করবে জানতে পেরে তরুণ যুবকেরা হৃষ্ট। বলদেব সিংহের পিতার মৃত্যু হয়েছিল পূর্ণ যৌবনে, সে তখন শিশু। তার মা তাকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে গিয়েছিলেন—সেই থেকে দুঃখিনী সেখানেই রয়েছেন। বড় হয়ে বলদেব পূর্বাঞ্চলে গিয়ে বাঙ্গলার এক রাজার বাড়ীতে পালোয়ানের কাজ নেয়। যথেষ্ট পয়সা রোজগার করেছে, তাই বোধহয় বাপ-পিতাম'র জমির ওপর এখন এই টান।

ভগ্নপ্রায় ঘর আবার তৈরী হ'ল। তার গ্রামে আসায় যেন এক নবজীবনের সঞ্চার হল, যেন যৌবনের জোয়ার এল গাঁয়ে। আখড়া তৈরী হ'ল, তাতে কুস্তি শুরু হ'ল। ভোর বেলা কুস্তি, সন্ধ্যাবেলা তার পাঁয়তারা, লাঠি চালান, গদা ভাঁজা ইত্যাদি। হাটের দিন বলদেব সিংহ নিজের শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে যখন চলত, সে একটা দেখবার মত দৃশ্য ছিল।

আগে আগে চলেছে বলদেব সিংহ। তার পায়ে বুট জুতো, বাঙ্গলা দেশ থেকে আনা। পরনে ধুতী—মালকোঁচা বেঁধে অদ্ভুত ভাবে পরা, হাঁটু থেকে সামান্যই নেবেছে, হাঁটুর কাছে ধুতীর কোঁচা দুলতো চলবার সময়। লম্বা পাঞ্জাবী পরা, গলার কাছে তার কেবল একটী ঘুণ্ডীর বন্ধনী। বেশ চওড়া ঘেরওয়ালা পাঞ্জাবী, আস্তিন এত চওড়া যে হাতীর পা ঢুকে যেতে পারে। গলায় তার কাছাকাছি করে গাঁথা সোনার তাবিজের হার, তাবিজগুলোর মধ্যে কিছু অর্ধ-চন্দ্রাকার আর কিছু বা চৌকো। মাথায় চুড়োওয়ালা পাগড়ি, তার লম্বা ফেটাটা

পিঠে ঝুলতো। হাতে তার লাঠি—সর্ষের তেল আর কাঁচা দুধ খাইয়ে লালন করা লাল টকটকে লাঠি। কখনও বা হাতে থাকতো মোটা ডাণ্ডা, জামার তলায় কোমর থেকে ঝোলান গঁড়াসের[২] ফলা, নিমেষে লাঠির সঙ্গে ফিট হয়ে একেবারে সাক্ষাৎ যম হয়ে যায়। নিজের শক্তি-সাহসের ওপর তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে বাঘের মত পথ চলতো সে। আগে আগে বলদেব আর তার পেছনে এই রকম সাজসজ্জায় আর রঙ ঢঙ্গে চলতো তার শিষ্যেরা। রাস্তায়-ঘাটে তাদের সুন্দর সুগঠিত শরীর দেখে সকলেরই চোখ যেন জুড়িয়ে যেতো।

শরীরে এত শক্তি, কিন্তু স্বভাব যেন শিশুর মত নিরীহ, নির্বিকার। মুখে সর্বদাই হাসি, সকলের সঙ্গে নম্র ব্যবহার, কখনও তাকে কেউ রাগ করতে দেখেনি, সকলকে সাহায্য করবার জন্য সর্বদাই সে প্রস্তুত। বালকেরা তাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরতো, বৃদ্ধদের দৃষ্টি থেকে তার ওপর আশীর্বাদের ধারা বর্ষণ হতো। যুবকেরা তো তাকে দেবতার মতই মনে করতো।

সে সময় হিন্দু-মুসলমানে ঝগড়া ছিল না, দুই সম্প্রদায় দুধ-চিনির মত মিলে-মিশে থাকতো। হিন্দুদের দোলের উৎসবে মুসলমানদের দাড়ি রঙিয়ে যেতো আর মুসলমানদের মহরমের তাজিয়ায় হিন্দুদের কাঁধ লাগতো।

তাজিয়ার দিন ছিল তখন। আমাদের গ্রামেও তাজিয়া তৈরি হয়েছিল—যদিও গাঁয়ে একটী মুসলমানেরও বাস ছিল না। এক বৃদ্ধ মৌলবীকে ডাকা হয়েছিল, তিনিই ধার্মিক অনুষ্ঠানগুলি করে নিতেন। আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল তাজিয়া ঘিরে হৈ-চৈ করা। সন্ধ্যা হল, তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে সকলে একত্র হলাম। তাশ[৩] বাজছে,

---

২ গঁড়াসে—বাঁকান ছুরির ফলা, লাঠিতে লাগিয়ে ব্যবহার হয়।

৩ তাশ—এক প্রকার দেশী বাজনা।

লাঠি খেলা চলছে, গদা ভাঁজা হচ্ছে, কুস্তির পাঁয়তারা হচ্ছে। লাঠি-খেলায় সে কত রকমের শারীরিক কৌশল! স্ত্রীলোক ও শিশুরা 'মর্সিয়া'[৪] গানের নামে কোলাহল করছে। এই সব খেলায়, উৎসবে অর্দ্ধরাত্রি তো কেটেই যেতো।

তাজিয়ার 'পহলাম'[৫] সেদিন, গ্রাম থেকে দূরে রাজপুত বস্তিতে 'রণ'[৬] তৈরি হতো, সেইখানে আশপাশের সমস্ত গ্রামের তাজিয়া একত্রিত হতো। অগাধ ভিড়, কত রঙের কাপড়ের ঝলকানি, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও স্ত্রীলোকের ভিড়। যুদ্ধের নানা রকম উত্তেজক বাজনা বাজছে। মর্সিয়ার মিষ্টি সুরে 'হায় আলী'র গগনভেদী স্বর। চারদিক যেন কেঁপে উঠছে, আকাশ কেঁপে উঠছে, বুক উদ্বেল হয়ে উঠছে। সারা এলাকার যুবকদের এ এক বিশিষ্ট দিন। সকলে সুসজ্জিত হয়ে জমা হয়েছে। যথারীতি কুস্তি হচ্ছে, ভেড়ার লড়াই হচ্ছে আর লাঠি, গদা, সড়কি নিয়ে হাতের কত কসরৎ! দেখতে দেখতে দর্শকের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেলো। দু দল দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে উৎসাহিত করছে। দু দলই নিজের নিজের 'হিরোর' বিজয় চায়। কখনও কখনও এই বীরপূজার উৎসাহে দু দলে 'চ্যালেঞ্জ' হয়ে যেতো, চোখ হয়ে উঠতো রাঙ্গা, হাত চঞ্চল হয়ে উঠতো। মনে হতো সত্যিকার ঝগড়া লেগে গেলো বুঝি। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই শুভবুদ্ধির কাছে এই মনোভাব পরাস্ত হতো—যেন সমুদ্রের জোয়ার শান্ত হয়ে যেতো। আবার চোখের দৃষ্টি রসিয়ে উঠতো, ঠোঁটে আবার হাসির রেখা ফুটতো।

আমরাও নিজেদের তাজিয়া নিয়ে 'রণে' পৌঁছেছি। এক জায়গায়

৪ মর্সিয়া—মহরমের শোকগাথা

৫ পহলাম—তাজিয়া বিসর্জনের দিন

৬ রণ—মহরমে কৃত্রিম রণসজ্জা

ভেড়ার লড়াই হচ্ছিল, আমি তাই দেখছিলাম। ভেড়ার লড়াই—ওঃ সে এমন রোমাঞ্চক! এই-ছোট ছোট ঝাঁকড়া লোমওয়ালা প্রাণীগুলো মালিকের পেছনে কি নিরীহ ভাবেই না বেড়ায়, কিন্তু লড়াই-এর সময় কি বিক্রমে পরস্পরের ওপর লাফিয়ে পড়ে তা দেখবার বস্তু। শিং-এর সঙ্গে শিং-এর ঠোক্কর লাগলে একটা জোর শব্দ হয় আর যেন ধোঁয়ার মতন কিছু ওঠে—গুঁতোর ওপর গুঁতো মারতে থাকে যতক্ষণ না একটা পড়ে যায় বা দুটোকে আলাদা করে দেওয়া যায়। লড়াই-এর আগে ভেড়াগুলোর মুখে শুকনো লঙ্কা দিয়ে যেন তাদের আরো উত্তেজিত করে দেওয়া হয়। আমি ভেড়া লড়ান দেখতে দেখতে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছি—এমন সময়…

খুব জোরে একটা গোলমাল উঠলো। সকলেই এক দিকে দৌড়াচ্ছে, আর সেইদিকে লাঠির খটাখট শব্দ শোনা যাচ্ছে। ও শব্দ খেলার শব্দ নয়—অনেকগুলো মাথা থেকে রক্তের যেন ফোয়ারা ছুটছে!

আরে, মাঝখানে কে রয়েছে? বলদেব সিংহ! সেই হাসিমুখ, সরস চেহারা বলদেব সিংহ এ নয়। এ বলদেব সিংহ যেন সাক্ষাৎ ভীম। তার চোখ থেকে আগুন ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে। মাথায় একটা লাঠির ঘা পড়েছে, ক্ষত থেকে রক্ত বার হয়ে কপাল বেয়ে ভ্রূর ওপর দলা বেঁধে জমে আছে। দু হাতে লাঠি ধরে সে মহা বিক্রমে চালিয়ে যাচ্ছে। যে-দিক দিয়ে সে পথ করে নিচ্ছে সে দিকে হাহাকার পড়ে যাচ্ছে। দেখ দেখ, কে এক জন লাঠি বাগিয়ে এগিয়ে এল—ওকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়লো, চালিয়ে দিল লাঠি। নিমেষের মধ্যে নিজের লাঠির দুই প্রান্ত দু হাতে ধরে সে নিজের মাথার ওপর ধরলো। তার লাঠির চোট ঠকাস্‌ করে সেই লাঠিতে লাগলো—দ্বিতীয় বার, তৃতীয় বার—। বার বার চোট ব্যর্থ যেতে দেখে সে লোকটা পালাল।

কিন্তু এবার বলদেব সিং-এর পালা—বলদেব সিং-এর লাঠির এক ঘায়ে সে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো। আরে, এ আবার কি বেধে গেলো? চারদিকে হাহাকার। সবাই পালাচ্ছে। সকলেই বুঝলো একটা কুরুক্ষেত্র লেগে গেলো এবার। কে কাকে কি বলে বোঝায়—কেই বা কার কথা শুনছে? —তাছাড়া বলদেব সিংকে শান্ত করতে না পারলে কি করে শান্তি হবে?

সেই সময়ে চট করে আমার বৃদ্ধ মামা এগিয়ে গেলেন। চেঁচিয়ে ডাকলেন—'বলদেব!' বলদেব সিং যেন কেঁপে উঠলো, মাটির সঙ্গে তার পা গেঁথে গেলো, হাত তার থেমে গেলো। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল:

'কাকা, আমায় আপনি বাধা দিবেন না,—এদের লাঠির বড় বড়াই হয়েছে। আমি একবার এদের শেখাতে চাই লাঠি কাকে বলে'—তার নিশ্বাস জোরে জোরে পড়ছে, রাগে কথাগুলো ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনাচ্ছে। সত্যই এতে বলদেব সিং-এর কোন হাত ছিল না, তাকে নিরুপায় হয়ে এতে যোগ দিতে হয়েছিল। দুজনের কুস্তি হচ্ছিল—দুই পালোয়ানই বলদেব সিং-এর অপরিচিত। একজন এদের মধ্যে অন্যায় কৌশল প্রয়োগ করল, বলদেব দূর থেকেই তাকে বাধা দিল: 'এ রকম করা অনুচিত।' আর যাবে কোথা—তার এ কথা শুনেই তার দলের লোকেরা রেগে গেলো তার ওপর।

আসলে এ অঞ্চলে তাদের লাঠির হাঁকডাক ছিল। তাদের সাত খুন মাপ যেন। কিন্তু বলদেব সিংহ ধমক সয়ে যাবার পাত্র নয়। কথায় কথায় রোখ চড়ে গেলো, আর তার ফলেই এই।

যাই হোক, মামা মাঝখানে এসে পড়ায় বলদেব শান্ত হ'ল। কিন্তু ততক্ষণে তো তার জিত হয়েইগেছে। শিষ্যদের সঙ্গে তাকে

নিয়ে আমরা সগৌরবে বাড়ী ফিরলাম। আমরা জিতেছি, আমাদের গ্রামই জিতেছে। যেন রাম লঙ্কা বিজয় করে অযোধ্যায় পৌঁছেছেন।

*   *   *

শেরশাহ বা শিবাজীর কালে জন্মালে বলদেব সিংহ হয়তো সেনাদলে ভরতি হতো আর তারপর সিপাই থেকে কোন সুবেদার হয়ে যেতো —এতে সন্দেহ ছিল না—রূপ, গুণ, সাহস সবই ছিল তার। সামন্ত যুগে উচ্চতম সেনানীর পদে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যা যা প্রয়োজন হতো এ সবই তার ছিল। সে সময়ে হলে বলদেব সিংহ কি রকম জাঁকজমক করে গ্রামে আসতো? ঘোড়ায় চড়ে, চুড়োদার পাগড়ি বেঁধে, ইয়া কড়া কড়া গোঁফ—সামনে পেছনে লোক-লস্কর নিয়ে সে আসতো। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে তা তো আর সম্ভব ছিল না। যতটুকু সম্ভব আমরা তাই দেখেছিলাম। তার বীরত্ব নিজের প্রকাশের পথ খুঁজে তো নিতই।

আমাদের গাঁ অদ্ভুত···চারদিকে রাজপুত আর গোয়ালার দল। রাজপুতেরা যদি রামের বড়াই করে তবে গোয়ালারা করে কৃষ্ণের যাদবত্বের বড়াই। দুই জাতে যেন বংশানুক্রমে শত্রুতা চলে আসছে। তুচ্ছ কথায় ঝগড়া, গোঁফ পাকানো, রক্ত চক্ষু—আর শেষ পর্য্যন্ত লাঠালাঠি। দু জাতে ছিল ঝগড়া, দলাদলি, আবার নিজের নিজের দলের মধ্যে সেই অবস্থা, ভাই ভাইয়ে শত্রুতা, প্রতিবেশীর সঙ্গে শত্রুতা। এক বিঘত জমির জন্যে, গাছের একটা আমের জন্যে, শিশুগাছের একটা ডালের জন্যে রক্তারক্তি হয়ে যেতো। আর এই লড়াইগুলো হতোও একেবারে আকস্মিক ভাবে। হয়ত জমি চাষ করতে করতে, গাছের তলায় বসে গল্পসল্প করতে করতে, এমন কি রাস্তা চলতেও

লেগে যেতো ঝগড়া। কিন্তু কখনও কখনও বেশ ঘটা করে জমিয়েই যুদ্ধ লেগে যেতো। দু দলের পক্ষ নিয়ে তাদের ভাই-বন্ধু-আত্মীয়-কুটুম্ব জমা হোত, আবার কিছু ভাড়াটে লোকও জোগাড় করা হোত। এই সব অবসরে যখনই আমাদের তল্লাটে ঝগড়া-লড়াই জমে উঠতো, তখন নিশ্চয় কোন-না-কোন পক্ষ হতে বলদেবের ডাক পড়তোই। আর 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ'র আর্ষ বাক্যের মতই যে-পক্ষে বলদেব সিংহ সেই পক্ষের-ই জয় নিশ্চিত।

একবার আমি এই রকম একটা ধর্মযুদ্ধ দেখবার সুযোগ পেলাম। বিস্নুনপুরে ক্ষত্রিয়দের দু ভাই। প্রথমে খুব মিল ছিল কিন্তু শেষে এমন শত্রুতা হলো যে পরস্পরকে প্রাণে মারবার চেষ্টা চলতে লাগলো। ঘরদোর, জমি-জমা সব ভাগ-বখরা হয়ে গিয়েছিল। একই উঠোনে দু ভাই যেন দু জগতের জীব।

একবার কেমন করে একটা আম গাছ নিয়ে দুই ভাইয়ে মন কষাকষি হল। ল্যাংড়া আমের গাছ। আমি গিয়ে দেখলাম ফলের ভারে তার ডালগুলো যেন মাটিতে নুয়ে পড়েছে। সাদা বোঁটাওয়ালা আমের গোছাগুলোর মধ্যে পাতাগুলো যেন দেখাই যায় না। গাছটা ছিল বেশ পুরোন, খুব ঝাঁকড়ে গিয়েছিল। অন্যান্য বছরেও বেশ ফল দিত, কিন্তু এ বছর যেন একটা মহাভারত কাণ্ড করবার জন্যেই গাছটা দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত অফুরন্ত ফলে ভরে গিয়েছিল। কি তার মন-ভোলান রূপ!

শুনলাম এ গাছটাও ভাগ হয়ে গেছে, ছোট ভাইএর অংশে পড়েছিল গাছটা, গত ক'বছর ধরে গাছটার ফল সেই ভোগ করছিল। কিন্তু এবার বড় ভাইএর ছেলে হিসাব করে দেখলো এ গাছ তো তার ভাগেই পড়া উচিত ছিল—নেহাৎই ভুল করে কাকার অংশে পড়েছে।

গাছের সংখ্যা গুণে খতিয়ান দেখিয়ে সে প্রমাণ করে দিল, তার দাবি ন্যায্য।

কিন্তু খতিয়ান দেখিয়ে আর কি হবে? 'গাছ যদি তোমার, পুরুষের বাচ্চা যদি হও—চড় গাছে, পাড় ফল—খাও—। আর না হলে স্ত্রীর আঁচলে মুখ ঢেকে ঘুমোও—' সোজা তর্ক সোজা কথা। এর উত্তরে একদিন ঘোষণা হ'ল: 'আগামী সোমবারে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ফল পাড়বো। কোন হারামজাদা লুকিয়ে ফল পাড়ে—' দিন ক্ষণ সব ঠিক! দু পক্ষই দল ভারি করবার জোগাড়ে লেগে গেলো।

দু পক্ষ থেকেই বলদেব সিংএর কাছে নিমন্ত্রণ এল। কিন্তু তার ছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা—যে নিজে প্রথমে তার কাছে আসবে তারই দলে যাবে সে—চিঠি পত্রের সে ধার ধারে না। বড় ভাইয়ের ছেলে একদিন ঘোড়ায় চড়ে হাজির। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হচ্ছে—এমন সময় এসে পৌছালো ছোট ভাই। কিন্তু ততক্ষণে সে কথা দিয়ে ফেলেছে। পরদিন শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সে বিস্থনপুরে গেলো।

আজই যুদ্ধ। গুরুজনদের আজ্ঞা—'লড়াই ঝগড়া থেকে দূরে থাকাই উচিত, কারণ অনেক সময় তা'তে নির্দোষও ফেঁসে যায়—মারও খেয়ে যায়।' কৌতূহল বশে আমিও অনায়াসে দর্শকদের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। তারা চারদিক থেকে বিস্থনপুরেই আসছিল।

সেদিন বিস্থনপুর যেন কুরুক্ষেত্র। মাঝখানে সেই আমগাছ নিশ্চল নির্বিকার খাড়া রয়েছে। তার দু দিকে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল জমা হয়েছে। বর্শার ফলাগুলোয় রোদ পড়ে চকচক করছে, গঁড়াসগুলো চাঁদের মত জল্‌জল্‌। কুঠারগুলো দেখে পরশুরামের কাহিনী মনে পড়ে। ঢ্যামনা সাপের মত নাচছে যেন লাঠিগুলো। তলোয়ারের সংখ্যা নগণ্য, কারণ তার প্রতি ইংরেজ সরকারের শনিদৃষ্টি আগেই পড়েছে। তবে

লাঠিয়ালরা বলে, বর্শা আর কুড়ুলের কাছে তলোয়ার কোন ছার! আমার কান তর্কের কচকচির মধ্যে ছিল না, আমি অবাক বিস্ময়ে যুদ্ধের তোড়জোড় দেখছিলাম। সামনে ছিল তাদের ভিড়, দর্শকদের ভিড় চার দিকে—আশেপাশে। থেকে থেকে জয়ধ্বনি উঠছে, হাঁক পড়ছে দ্বন্দ্বে নেবে যাবার। হঠাৎ মাঝে মাঝে আলহার[৭] বীরত্ব গাথার দু এক কলি শোনা যাচ্ছিল।

'বলো—মহাবীর স্বামী কি জয়'—ধ্বনি সহকারে দু পক্ষের যোদ্ধারা আম গাছটার দিকে দৌড়ে গেলো। দর্শকদের বুক ধুক্ ধুক্ করতে লাগলো। হায় রে! এখনই তো এদের মধ্যে কতজন মরবে কতক বা আহত হয়ে পড়ে থাকবে। 'উঃ'—আমার মুখ থেকে শব্দ ভাল করে বারও হ'ল না, দেখলাম, বড় ভাইএর দলের পুরোভাগে রয়েছে বলদেব সিংহ। তার দু পাশে দুই প্রধান শিষ্য আমাদের গ্রামেরই ছেলে। বলদেব সিং-এর মাথায় জাফরাণী রঙএর পাগড়ি। পায়ে সেই বুটজুতো, সেই লম্বা চওড়া পাঞ্জাবী গায়ে—কিন্তু এখন তার ঘেরটাকে কোমরে একটা পটির তলায় গুঁজে রেখেছে, যাতে জামাটার জন্য লাফাতে ঝাঁপাতে অসুবিধা না হয়। আর, তার ধুতি তো প্রায় হাফ-প্যাণ্টের কাজই দিত। মুখটা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

সে আম গাছের কাছে এগিয়ে গেলো। তার ইশারা পেয়ে শিষ্য দুজনে চট করে আম গাছটায় চড়ে গেলো আর গাছটাকে নাড়া দিয়ে নির্মম ভাবে ফলগুলো ফেলতে লাগলো। বলদেব সিংএর গর্জন শুনলাম—'কে আছিস মায়ের ব্যাটা এগিয়ে আয়—'। বিপক্ষ দল

---

৭ আলহা এক অর্দ্ধ-ঐতিহাসিক বীর পুরুষ, তার সম্বন্ধে গাথাকেও আলাহা বলা হয়।

হকচকিয়ে তাকে দেখছিল, যেন তারাও দর্শকেরই সামিল। তার হাঁকার শুনে যেন বিপক্ষ দলের আত্মজ্ঞান ফিরে এল। তারপর আর কি—লেগে গেলো দু দলে। লাঠির খটাখট শব্দ, গঁড়াসের মারের শব্দ, বল্লমের শন্‌শন্‌ শব্দে বায়ুমণ্ডল যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো। জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হাহাকারও উঠলো। একজনের মাথায় লাঠি পড়েছে, মাথা ফেটে দু ফাটা হয়ে রক্তের ধারা বয়ে যাচ্ছে। কারো পেটে বর্শার ফলা ঢুকেছিল, সেটার সঙ্গে সঙ্গে পেটের অন্ত্রগুলো পর্য্যন্ত বার হয়ে এসেছে। দু হাতে সেগুলো চেপে ধরে সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। যে হাত এক মুহূর্ত আগেও লাঠি ভাঁজছিল, গঁড়াসের এক কোপে সে হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, মাটির ওপরে পড়ে এখনও থেকে থেকে ছট্‌ফট্‌ করছে সেটা। চারদিকে রক্ত আর কাতরানির শব্দ। আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেছে।

চোখ মেলে যখন চাইলাম ততক্ষণে কাজ সাবাড়। গাছটাতে বড় ভাইএর দখল সাব্যস্ত হয়ে গেছে। দখল দেওয়ানো'তে বলদেব সিংএর হাতের কারসাজিটাই প্রধান। ইচ্ছা হ'ল আমার, 'হিরো'কে দেখবার—কিন্তু শুনলাম, তামাশা শেষ হবার পর এতক্ষণে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেখানে পৌছেছেন; তাই লোকেরা বলদেব সিংকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। 'বলদেব সিং, জিৎ তো তোমার। এখন তো হবে কেবল টাকা ঢালার খেলা, তুমি এবার স'রে যাও এবার আমার পালা'—বড় ভাইএর বড় ছেলে বলল। যাবার সময় বলদেব সিং-এর গলায় পরিয়ে দিল সে মোহরের মালা।

* * *

সেই বলদেব সিং-এর লাশ সামনে পড়ে আছে।

মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ, যেন থেঁতলে দিয়েছে। রক্ত আর ধূলোয়

মাথামাখি। যে ললাট হ'তে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো তার ওপর মাছি ভন্‌ভন্‌ করছে। একটা চোখ ভেতরে ধ্বসে গেছে, অন্যটা বার হয়ে এসেছে। ঠোঁট ফুটো করে দাঁত বার হয়ে এসেছে। না, না এ আমাদের বলদেব সিং হতেই পারে না। বলদেব সিংএর এই হাল?

একটা গঁড়াস তার কাঁধে বিঁধে আছে সেই বাহুটা ঝুলে গেছে। অন্য হাতটার সমস্ত পাঞ্জাটাই লুপ্ত। বুকটা তেমনি ফুলে আছে—আরো যেন বেশি, কিন্তু পেটের সমস্ত অন্ত্র বার হয়ে গেছে। সেই বেরিয়ে-আসা অন্ত্রের ভয়াবহ পরিমাণ—সে কি বীভৎস! না না—এ আমাদের বলদেব সিং হতে পারে না।

পা দুখানা পিটিয়ে যেন কারা ভুট্টার ডাঁটার মত বাঁকিয়ে তুবড়ে দিয়েছে। কোথাও অদ্ভুতভাবে ফুলে আছে কোথাও বা রক্তের ধারা। ধারা তো কখন শুকিয়ে গেছে এখন শুধু কালো রক্তের দাগ। মাছি ভন্ ভন্ করছে তার ওপর। না না এ আমাদের বলদেব সিং নয়।

বলদেব সিং-এর এই গতি?

যার দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে সাধ যেন মিটতো না, সন্তানের জননীরা যাকে দেখে নিজের সন্তানের জন্যে এমনি ঐশ্বর্যবান দেহের কামনা করতো, যুবতীরা যাকে দেখে ভাবতো ধন্য সেই নারী, যার পতি এমন—পরজন্মে এমন স্বামীরই কামনা কোরতো ভগবানের কাছে; বৃদ্ধেরা বলতো 'শতায়ু হও', যুবকেরা যার জন্যে পাগল হয়ে তার পিছনে না কেনা গোলাম হয়ে ফিরতো—সেই দেহই আজ সামনে পড়ে আছে। রক্তে মাখা, ধুলোয় ভরা, ক্ষত বিক্ষত, কুরূপ কুৎসিত—তার ওপর মাছি ভন্ ভন্ করছে।

এই মহাবীরের এমন গতি কে করলো? আর কোন মায়ের এমনই বীর সন্তান আছে?

হায় তারই মত কোন বীরের হাতে যদি তার এ দশা হোতো। দুই বাঘে যখন লড়াই হয় একটা পড়ে। এ তো অবশ্যম্ভাবী, এর জন্য হা হুতাশ করবার কি আছে? বলদেব সিং তো এমনি মরণই চেয়েছিল। মৃত্যুভয় তো তার ছিল না। মৃত্যুর চোখে চোখ মিলিয়ে মুচ্‌কি হাসি হেসেছে বলদেব সিং। ক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে, এই কামনাই সে করেছিল। তার কামনা পূর্ণ হয়েছে, বীরগতি লাভ করে, সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করে সে অমরাপুরী যাত্রা করেছে। তাতে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু, যে হাতে তার এই দশা হয়েছে সে কি বীরের বাহু? বাঘের পাঞ্জা তার? না না, কতকগুলো শৃগাল, কাপুরুষ মিলে লুকিয়ে পিছন থেকে তাকে আঘাত করেছে। বড় অসময়ে, বড়ই নীচ উপায়ে এই কুকার্য করেছে তারা। কল্পনা করলেও রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ওঠে। উঃ।

একদিন সেই এলাকারই ভিন গাঁয়ের এক বিধবা বলদেবের সন্ধানে আমাদের গ্রামে এল। সে বেচারীর সঙ্গে একটী বালকও ছিল। তারই ছেলে। অসহায় বিধবা আর সেই অসহায় ক্ষত্রিয় শিশুর অবস্থার সুযোগ নিয়ে 'পট্টিদারেরা'[৮] তার যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে। বিধবার কানেও বলদেব সিং-এর যশঃ পৌঁছেছিল। তার নাম তো এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে, ঘরে, ঘরে, প্রত্যেক যুবক আর তরুণের কাছে ছড়িয়ে পড়েছিল। বলদেব সিংএর দরবারে আরজী নিয়ে এল বিধবা। যখন পট্টিদারেরা এ কথা জানতে পারলো যে, বিধবা বলদেব সিংএর কাছে যাচ্ছে তারা তাকে শ্লেষ বিদ্রূপ করে শুনিয়ে দিল—যে সে তার দ্বিতীয় স্বামীকে আনতে যাচ্ছে! দ্বিতীয় স্বামী ক্ষত্রিয় রমণীর? বিধবা সমস্ত কাহিনী শুনিয়ে বলদেব সিংএর পায়ে পড়লো: 'বাবু আমার মান

৮ পট্টিদার—জমি, শস্য ইত্যাদির অংশীদার

বাঁচাও।' বলদেব সিং বালককে কাঁধে নিয়ে সেই গাঁয়ের পথে যাত্রা করলো।

যখন যাচ্ছিল, গাঁয়ের বাইরে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বল্লাম 'প্রণাম ভাই'। তার চেহারায় স্পষ্ট রাগের ছাপ তবু স্বাভাবিকভাবে হেসেই আমায় আশীর্বাদ করে বলল: 'এক অসহায় স্ত্রীলোককে রক্ষা করতে যাচ্ছি, দু চার দিনেই ফিরে আসবো ভাই।'

বলদেব সিং আর ফিরে এল না, এল তার এই লাশ।

সেখানে গিয়েই সেই পট্টিদারদের সে চ্যালেঞ্জ করলো। দ্বিতীয় দিনে তাদের কেড়ে নেওয়া বিধবার একটা ক্ষেতে হাল দিইয়ে দিল। কেউ কিছুই বলল না। কে বলবে? একটার পর একটা ক্ষেত বিধবার অধিকারে এলো, বহুদিন ধরে ঠকিয়ে নেওয়া একটা আম বাগান এবার সে ফিরে পেলো। বাগানের লিচু গাছের ডালে দোলনা টাঙ্গিয়ে সেই ক্ষত্রিয় বালকটিকে বলদেব সিং দোল্ দিতো। যারা আগে ভয়ে কথা বলতো না তারাও এখন বলদেবকে বাহাদুরী দিতে লাগলো, সেই বালকটীর সঙ্গে পুরাণো সম্পর্ক আবার তাদের মনে পড়লো কারণ এখন তো আর সে বিধবা অসহায় নয়। নিজের বাপকে হারিয়ে শিশু যেন তার ধর্ম বাপকে পেয়েছে।

বলদেব সিংএর সঙ্গে তার কএকজন শিষ্যও গিয়েছিল। যখন সমস্ত ব্যাপারের নিষ্পত্তি হয়ে গেলো—আর, সে গ্রামেরও অনেকে যখন তার পক্ষ নিলো, তখন সে এক এক করে তার শিষ্যদের সেখান থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলো। বেচারী বিধবার ঘাড়ে আর বৃথা খরচার বোঝা কেন চাপায়! শেষে এক দিন ঠিক করলো—'কাল আমি যাবো।'

কিন্তু সেই 'কাল' আর তার দেখা হলো না। তার প্রাতঃকৃত্যের অভ্যাস ছিল খুব ভোরে—প্রায় অন্ধকার থাকতেই। গ্রাম হতে অনেকটা

দূরে চলে যেতো সে। যতদিন ঝগড়া চলছিল ততদিন সে তার এক শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে যেতো, হাতিয়ার সর্বদাই সঙ্গে থাকতো, অন্তত হাতে লাঠি আর কোমরে গোঁজা গঁড়াসে—যেটাকে নিমেষের মধ্যে লাঠিতে জুড়ে নেওয়া যেতো। কিন্তু সেদিন পরম নিশ্চিন্ত হয়ে কেবল ঘটি হাতে নিয়ে বার হ'ল বলদেব সিং। সারা গ্রাম ভোর রাত্রের সুখনিদ্রায় মগ্ন। কিন্তু তার জন্য মৃত্যুর ফাঁদ পাতা হয়ে গিয়েছে।

একটা নীচু জমিতে সে শৌচের জন্য বসেছে সেই সময় তার মাথায় লাঠির প্রচণ্ড আঘাত হ'ল। মুহূর্তের জন্য সে অজ্ঞান হয়ে গেলো কিন্তু আবার উঠে দাঁড়ালো, নিজের ঘটিটা দিয়ে ঢালের মত আঘাত বাঁচাতে চেষ্টা করলো। আবার এক লাঠির ঘা পড়লো ঘটির ওপর—'ঠন' করে শব্দ হলো। এবার তৃতীয় লাঠি—ফুল কাঁশার ঘটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো। তারপর আর কি—লাঠি, গঁড়াসে, বর্শা চারদিক থেকে বর্ষণ হতে লাগলো। অভিমন্যুর মত একবার সে লাফিয়ে সেই চক্রব্যূহ ভেদ করবার চেষ্টা করলো, কিন্তু আবার ঘেরাও করলো তারা। আহা! সেই নিস্তব্ধ বিশ্বে যখন সকলে সুখনিদ্রায় মগ্ন, সেই ভীরু কাপুরুষ শৃগালের দল এই মহাবীরের এই দশা করে দিলো। সামনে পড়ে আছে আজ সেই দেহ।

সেও ছিলো এমনই এক ভোর বেলা যেদিন বলদেব সিংএর সেই রূপ দেখেছিলাম জ্যোতির্ময়, জীবনরসে পরিপূর্ণ যৌবনের রূপ। আর আজও আর একটা ভোরে তাকে এই রূপে দেখতে হলো!

হায় রে!

সরযূ ভাই

মা সরযূ নয়—সরযূ ভাই। আমাদের দেশের একটা গ্রাম্য বৈশিষ্ট্য এই যে প্রায়ই পুরুষ মানুষের নাম গঙ্গা, যমুনা, সরযূ ইত্যাদি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরা সৌভাগ্যবতী, কারণ তাদের নামে এই প্রকার লিঙ্গ বিভ্রাট বড় একটা ঘটে না।

—হাঁ, সরযূ ভাইএর কাহিনী। আমার বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া যে বাড়িটা আছে একদিকে দুটো খোলার চালের ঘর, একদিকে খড়ের চাল ছাওয়া মাটির দেওয়াল, আর একদিকে বাঁশের চ্যাচারির তৈরি দুটো কুঁড়েঘর, বাকি দিকটায় ঘর নেই কেবল চালা খাড়া করে একটা ছোট মত উঠোন। এই বাড়িরই ভাগ্যবান মালিক আমাদের সরযূ ভাই। সরযূ ভাইয়ের নিজের কোন ছোট ভাই নেই, এবং আমি এসেছিলাম আমার মায়ের কোলে প্রথম সন্তানরূপে—সুতরাং আমরা দুজনে পরস্পরের সঙ্গে এক সম্বন্ধ গড়ে নিয়েছি। তিনি আমার দাদা আর আমি তাঁর ছোট ভাই।

গ্রামের সবচেয়ে রোগা আর লম্বা লোকেদের মধ্যে সরযূ ভাই অন্যতম। রঙ ময়লা, বকের মত বড় বড় ঠ্যাং, শিম্পাঞ্জীর মত বড় বড় হাত। পরনে ধুতি, কাঁধে গামছা। যখন তিনি দাঁড়ান, তাঁর পাঁজরের প্রত্যেকটি হাড় গুণে নেওয়া যায়। নাকটি লম্বা এবং বেশ উঁচু। ঘন ভুরু, বড় বড় চোখ দুটো কোটরগত। গাল বসা। প্রত্যেক অঙ্গের শিরা প্রকট—কখনও কখনও মনে হয় যেন এগুলো তার দেহের শিরা উপশিরা নয়, যেন কেউ পাতলা দড়ি দিয়ে তার সর্ব শরীর শক্ত করে জড়িয়ে রেখেছে।

নিঃসন্দেহে মনে হতে পারে যে উল্লিখিত বর্ণনা যেন কোন

দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের। কিন্তু তা কি সত্য? সরযূ ভাই আমাদের গ্রামের মুষ্টিমেয় সত্যিকার প্রাণবন্ত লোকেদের মধ্যে একজন। খুবই মিশুক, রসিক আর রগুড়ে। তিনি যখন প্রাণ খুলে হাসেন তখন তাঁর মুখের সবচেয়ে সেরা জিনিসটি—তাঁর সার গাঁথা ছোট ছোট দাঁত একেবারে ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে। সারা দেহ এমন দুলে দুলে ওঠে যেন তার প্রত্যেক অঙ্গটি হাসছে। এবং সরযূ ভাইএর এতটা সম্পত্তি এখনও আছে যে তিনি কেবল নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করতে পারেন তাই নয়, অতিথি-আগন্তুকের সেবা-সৎকারও ভালভাবেই করতে সমর্থ।

তবে এ রকম অস্থিচর্মসার চেহারা কেন?—তার উত্তরে আমি একটা পুরনো প্রবাদ উপস্থাপিত করছি—কাজী সায়েব রোগা কেন? —না শহরের চিন্তায়।

সরযূ ভাইয়ের এই যে অবস্থা তার জন্য নিজে তিনি দায়ী নন, তাঁর এ অবস্থা হয়েছে পরের জন্যই। পরের উপকারের জন্য তিনি যে কেবল নিজের শরীর পাত করেছেন তাই নয়, নিজের সম্পত্তিরও কিছু কম ক্ষতি করেন নি।

তাঁর বাবা গোমস্তাজী বলে পরিচিত ছিলেন—তিনি ছিলেন আমাদের গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু কিষান। চার দিকে ঘর, পরিষ্কার সুন্দর তাঁর বাড়ি ছিল—আর ছিল প্রশস্ত একটী বৈঠকখানা। যেখানে বৈঠকখানাটী ছিল এখন সেইখানে সরযূ ভাইএর আস্তানা। চাষবাস তো ছিলই, তা ছাড়া টাকাকড়ি আনাজপত্রের ভাল লেনদেন কারবার ছিল তাঁর। পরিবারও বেশী বড় বা খরুচে ছিল না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই সরযূ ভাই সে সব লেনদেন কারবার নষ্ট করে ফেললেন, বন্যায় ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেল আর ভূমিকম্পে বাড়িখানার সর্বনাশ হয়ে গেল। তাঁর তেজারতি

কারবার এত ভাল চলত যে তাই দিয়ে আবার চাষবাস সামলে নেওয়া যেতে পারত, বাড়িটাও তোলা যেত। কিন্তু কোথায় সরযূ ভাই আর কোথায় তেজারতি কারবার!

মহাজনী কারবার, যার সাদা নাম সুদখোরি! সে কাজ করতে মানুষকে মনুষ্যত্ব বর্জন করতে হয়, মানুষকে জোঁক—ছারপোকা, না, তাও নয়—উকুন হয়ে যেতে হয়। কালো জোঁক আর লাল ছারপোকার নিজস্ব অস্তিত্ব আছে। তাদের রক্ত শোষণ আমরা বেশ বুঝতে পারি, কারণ তাদের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষরূপে সে রক্ত দেখতে পাই। কিন্তু উকুন? নোংরা কাপড়ের ভাঁজে—সেই রকমই নোংরা রঙ তার—চুপচাপ পড়ে থেকে এমন করে মানুষের রক্ত চোষে আর সঙ্গে সঙ্গে সে রক্ত এমন ভাবে নিজের রঙে মিলিয়ে নেয় যে কিছু বুঝতেই পারা যায় না। যদি বা বুঝতে পারি তা হলে প্রথমে একটু অস্বস্তি বোধ হয়, জায়গাটা একটু চিন চিন করে কিন্তু তারপরে উকুনটাকে ধরতে গেলে দেখা যায় যে সেটা ধরবার জন্য অণুবীক্ষণের সাহায্য প্রয়োজন।

সরযূ ভাই তো আর উকুন হতে পারেন না। তাঁর এই দীর্ঘ দেহের মধ্যে যে হৃদয়টা রয়েছে তা তাঁর শরীরেরই অনুপাতে গঠিত। কোন দুঃখী মানুষ এল, নিজের বিপদ জানাল—তাকে ঠিক দেবতার মতই ঋণ কর্জ দেওয়া চাই। আবার ঋণ পরিশোধের সময় যখন সে চোখে জল নিয়ে অনুনয় বিনয় করল তখনও দেবতার মতই তিনি বিগলিত হয়ে গেলেন! সুদ তো দূরে যাক কিছু দিনের মধ্যে আসলও শূন্যের কোঠায় চলে যায়। এখন তো তাঁকে নিজেকেই ধারধোর করতে হয়।

বন্যা ও ভূমিকম্পে তাঁর ক্ষেত ও বাড়ি নষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, মহাজনী কারবার ছেড়েও যদি তিনি এই দুটোর দিকেই মন দিতেন তা হলে বর্তমান দুরবস্থা থেকে অনেক কিছুই রক্ষা পেত।

অকর্মণ্য, অলস গৃহস্থ তিনি নন—বরং ঠিক তার উল্টোটি, বেশ চালাক চটপটে কাজের লোক। কিন্তু করবেন কি? পরের কাজ করে তাঁর ফুরসত কোথায়?

গঙ্গোবাঈয়ের ঘরে ছেলের অসুখ, বদ্যি ডাকতে কে যাবে—না সরযূ ভাই। হিরুদের কিছু মালপত্র আনতে হবে বাজার থেকে—কাকে পাঠাবে—না সরযূ ভাইকে। খবর এসেছে রাম কুমারের মামা তাঁর গ্রামে বড় অসুখে পড়েছেন—সেখানে কাকে পাঠান যায়—সরযূ ভাই-এর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে? পরমেশ্বরের কিছু রেজিষ্ট্রী করাতে হবে, সনাক্ত করবে কে? না সরযূ ভাই। কারো বাড়ি বিয়ে বা পূজোআর্চা—তা সরযূ ভাইএর মাথায় সব ভার। কেউ মরলে, আবার তা যদি কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হয় তা হলে, মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড় কিনতে যাবার ভারও সরযূ ভাইয়ের। অর্থাৎ সমস্ত গ্রামের লোকের যাবতীয় ঝঞ্ঝাট নিজের মাথায় নিয়ে সরযূ ভাই নিজের ঘর চাষবাস সব মাটি করেছেন—এমন কি এই বয়সেই যেন ঝুঁকেও পড়েছেন। দিনই হোক বা রাতই হোক, চড়চড়ে দুপুর বেলাই হোক বা অন্ধকার অর্ধরাত্রিতেই হোক সরযূ ভাইএর সেবাসদনের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত। ভিক্টর হিউগো তার অমর সৃষ্টি 'লা মিজারেবল' উপন্যাসে লিখেছেন ডাক্তারের বাড়ির দ্বার কখনও বন্ধ থাকা উচিত নয় আর পাদরীর বাড়ির ফটক সর্বদাই খোলা থাকা উচিত। নিঃসন্দেহে সরযূ ভাই একাই এই দুটী মর্যাদা পেয়েছেন।

আমার ক্ষুদ্র বিচারে মনে হয় সরযূ ভাইএর ব্যক্তিত্ব যে কেবল অনুকরণযোগ্য বা অনুসরণযোগ্য তাই নয়, তা নমস্য ও পূজ্য। যখনই তাঁকে দেখি তখনই আমার জ্ঞান-গর্বিত শির যেন আপনা হতেই নত হয়ে যায় তাঁর চরণে। আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয় যখন দেখি

যে বেশীর ভাগ লোকই তাঁর মত রত্নকে শ্রদ্ধা তো করেই না উপরন্তু তাঁকে গোবেচারা ও নির্বোধ মনে করে ঠকাবার চেষ্টাই করে। শুধু এইটা হলেও সহ্য করা যেত, তাকে সময় অসময় ঝঞ্ঝাটে ফেলবার চেষ্টাও করে লোকেরা। কোন ঝঞ্ঝাট থেকে উদ্ধার করার কথা দূরে থাক, তাঁকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মজা দেখে লোকে।

এই কিছুদিন হ'ল একদিন সরযূ ভাই আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি কিছু পড়ছিলাম, মাথা না তুলেই বললাম: 'বসুন দাদা।' কিন্তু দাদা বসবেন কি—তাঁর মুখে তখন কথাই সরছে না, দু চোখে ভরা জল! দ্বিতীয় বার বলার পরও যখন বসলেন না তখন আমি মুখ তুলে তাকালাম। তাঁর মুখ দেখে আমি তো অবাক। ব্যাপার কি? অনেক আশ্বাস দেওয়ার পর, অনেক আগ্রহ দেখাবার পর তাঁর মুখ খুলল। শুনলাম তাঁর বাড়িতে একটা ছোট ব্যাপার ঘটে গেছে—গ্রামের অনেকের বাড়িতেই এ ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখেছি। কিন্তু কাউকেই এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে দেখিনি, এমন কি দরকার হলে ব্যাপারটা মিটমাট করিয়ে দিতেই দেখেছি। আবার এও দেখেছি যে কেউ তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাকেই তিরস্কৃত হতে হয়েছে। কেন? কারণ এ সব ঘটনা এমন সব ঘরে হয়েছে যাদের ঘরে কেবল মা লক্ষ্মী নয়, মা দুর্গাও আছেন, অর্থাৎ পয়সার সঙ্গে লাঠিও। কিন্তু সরযূ ভাই পরের জন্যই নিজের এ দুরবস্থা করেছেন। না আছে তাঁর অর্থের প্রতিপত্তি আর না আছে লাঠির জোর। সুতরাং তাঁকে আরো ভয় দেখানো, কাঁদানো হবে নাই বা কেন? আমি তাঁকে আশ্বাস দিলাম, তিনি কতকটা শান্ত হলেন। তিনি চলে যাবার পর আমি সারা রাত্রি লোকেদের হীন অকৃতজ্ঞতার কথা মনে করে আর ঘুমোতে পারলাম না।

তাঁর ভালমানুষির জন্য প্রতারিত হওয়ার একটি কাহিনী। অনেক দিন হয়ে গেছে আমার কিছু টাকার দরকার পড়ল। সরযূ ভাইএর কাছে তখন টাকা ছিল, আমার অসুবিধা হতে দেন কেন, তিনি টাকা এনে দিলেন। আমি খরচ করলাম সে টাকা, কিন্তু আজও শোধ দিয়ে উঠতে পারিনি। টাকা তো এসেছে, কিন্তু যা এসেছে খরচ হয়ে গেছে তার দ্বিগুণ। সরযূ ভাইও টাকা ফেরত চাইবার কথা কখনও ভাবেনই না। আমিও ভেবেছি তাঁর টাকা কোথায় যাবে? দরকার হলে যখন চাইবেন, আমি দিয়ে দেব। কিন্তু সেদিন তাঁর মুখে যা শুনলাম তাতে একেবারে থ হয়ে গেলাম।

এর মধ্যে তাঁর টাকার দরকার হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে ফেরত চাইতে তাঁর সঙ্কোচ হল। এক সুদখোর মহাজনের কাছে গেলেন—আগে সেই লোকটাই তাঁর কাছে ধার নিত, নানা রকমের ফন্দীবাজি করে এখন সে একেবারে 'ধন্না শেঠ' হয়ে গেছে। যাই হোক সে চট করে তাকে টাকাটা দিয়ে দিল, কিন্তু দাদা যখন টাকা নিয়ে চলে আসছেন তখন বলল: 'আপনার কাছ থেকে টাকা আর যাবে কোথায়—কিন্তু কিছু প্রমাণ তো থাকা চাই।'

'কি প্রমাণ চাই, আমি প্রস্তুত'—সরযূ ভাই টাকাটা নিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন, সেটা খুলে ফেরত দেওয়া চলে না, কাজে কাজেই তার দাবি মেনে নিতে হ'ল।

'না না, আর কিছু নয়, কেবল কাগজে একটা চিহ্ন করে দিন, আপনার কাছ থেকে পাকা হ্যাণ্ডনোট আর কি নেব?'

সরযূ ভাই ভোলানাথের মত কাজললতায় বুড়ো আঙ্গুল লাগিয়ে ছাপ মেরে দিয়ে চলে এলেন, ঠিক যেন একটা আধুনিক অ্যাণ্টোনিও কলিযুগের এক শাইলকের কাছে নিজেকে বেচে দিয়ে চলে এল…।

এখন মহাজন নাকি বলছে টাকা অবিলম্বে না পেলে নালিশ করবে। আর নালিশে যে কত টাকার দাবি করবে তা কে জানে? সরযূ ভাই দীন-ভাবে বলতে লাগলেন আর আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখ দেখতে লাগলাম।

'এমন ভুল আপনি করলেন কি করে?'—এর উত্তরে কি আর বলবেন—কেবল বললেন: 'টাকাটা বেঁধে ফেলেছিলাম কিনা;—'

সরযূ ভাইয়ের পাঁচটি সন্তান হয়েছিল কিন্তু সবগুলিই কন্যা। তাঁর স্ত্রী দৈর্ঘ্যে ঠিক তাঁর বিপরীত, কিন্তু অত্যন্ত বেঁটে হলেও গুণে তাঁর সমকক্ষ। সম্প্রতি পুত্রলাভের স্বপ্ন নিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। পুত্রলাভের স্বপ্ন সরযূ ভাইকে ব্যাকুল করেছে কিনা তা বলতে পারি না। মেয়েদের ওপর তাঁর খুবই স্নেহ। আমাদের বাড়ির ছেলে—অর্থাৎ আমার ছেলে ও ভাইপোদের শৈশবে অধিকাংশ সময় তাঁর কাঁধেই কেটেছে।···কিন্তু মেয়েরা? মেয়েরা তো নিজের নিজের শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে। তা হলে সরযূ ভাইয়ের একটা চিহ্নও কি গ্রামে থাকবে না? এ কল্পনাতে আমাদের বাড়ির সকলের বড়ই দুঃখ। সরযূ ভাইয়ের স্ত্রীর মৃত্যুর পর আমি আমার মামীমাকে বলতে শুনেছি: 'সরযূর বয়স আর কতই বা? আমার ছেলের চেয়ে বছর চারেকেরই বড়—সে আবার বিয়ে করবে না কেন? বংশ রাখতে হবে না?'

সেদিন দেখি আমার জেদী রাণী সরযূ ভাইএর সঙ্গে ঝগড়া করছে—'না না—বিয়ে আপনাকে করতেই হবে—'

'হাঁ, আমি বিয়ে করি যাতে শর্মাজীর (আমার) খুব সুবিধা হয় নতুন বৌদির সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবার—কি বল?'

আমায় দেখেই সরযূ ভাই এই কথা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন। রাণী একটু যেন লজ্জা পেল—তারপর সেও হেসে উঠল। আমি তাদের দুজনের দিকে চেয়ে নীরবে হাসতে লাগলাম।

মঙ্গর

গাঁট্টা গোট্টা শরীর। কোমরে একটী কৌপীন। কাঁধে জোয়াল, হাতে পাঁচন বাড়ি। সামনে চলেছে জোড়া বলদ। নিজের গলায় বিচিত্র আওয়াজ তুলেই বলদগুলোকে হাঁকাত। ভোর বেলায় আমাদের ক্ষেতের দিকে যেত—বোধহয় মঙ্গরের এই রূপটীই আমি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে এসেছি।

হ্যাঁ—কিন্তু মনে আছে জোয়ালের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কদাচিৎ আমারও তার কাঁধে চড়বার সৌভাগ্য ঘটেছে। তবে সে সৌভাগ্য বেশীবার ঘটেনি। কি জানি কেন তার শ্রেণীর আর সকলের মত শিশুদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ তার ছিল না। তাকে দেখে ছেলেরা পালাত, আর আজ যখন সে অশক্ত, জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে তখন ছেলেরা যেন প্রতিশোধ নেবার জন্যই তাদের ছোট ছোট লাঠিগুলো দিয়ে তাকে খোঁচা মেরে, বিরক্ত করে পালিয়ে যায়। সে যখন রেগে মেগে তাদের মারবার জন্য নিজের বার্দ্ধক্যের অবলম্বন লাঠিখানি তোলে বা গালাগালি দিতে থাকে তারা দূর থেকে খিল খিল করে হাসে আর ভ্যাংচায়।

শিশুদের প্রতি তার এ বিতৃষ্ণা কেন হ'ল? একটি মাত্র যে ছেলে হয়েছিল সেও উপার্জ্জনক্ষম হবার আগেই বাপকে দাগা দিয়ে মারা যায় বলেই কি? অথবা এই জন্যই কি যে, তার যে মেয়েটা বেঁচেছিল সে মলো? অনেক ধুমধাম করে বিয়ে দিয়েছিল তার, কিন্তু যখন সেবার কিছু বিপন্ন হয়ে তার দোরে গিয়েছিল তখন জামাইএর দুর্ব্ব্যবহারে আত্মমর্য্যাদাশীল মঙ্গর সেখানে এক দণ্ড তিষ্ঠুতে পারেনি।

মঙ্গরের আত্মমর্য্যাদা! গরীবদেরও কি আবার তা থাকে নাকি? কিন্তু মঙ্গরের বিশেষত্ব এইখানে। মঙ্গর কখনও কারো ঠেস দিয়ে কথা

বলা সহ্য করেনি। বোধহয় অন্তরে কখনও সে কাউকে নিজের চেয়ে বড় বলে মনে করেনি। আমার ঠাকুর্দ্দা মশাইকে সে সম্মান করত— সম্ভবতঃ তিনি বৃদ্ধ ছিলেন সেই জন্য। আমার বাবাকে সে ভালবাসত সম্ভবতঃ এই জন্য যে, তাঁর মধুর প্রকৃতিতে সে বশ হয়েছিল। কিন্তু কাকাদের সে সর্ব্বদা নিজের সমকক্ষ বলেই মনে করত। আমার সঙ্গে তো এই সেদিন পর্য্যন্ত তুই তোকারি করে কথা বলত। কার সাধ্য মঙ্গরকে দুটো কড়া কথা বলে—হাল মজুরদের অনবরত যে রকম মুগ-শিস্তি করা হয় সে সব তো দূরের কথা।

এটা সম্ভব হল কেমন করে? এর প্রধান কারণ মঙ্গরের বলিষ্ঠ দেহ এবং তার চেয়েও বড় কারণ তার অসীম কর্ম্মক্ষমতা। আবার তার সঙ্গে সততার মিশ্রণে যেন ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে। যে সময়ের মধ্যে অপরের দশ কাঠা জমিতে লাঙ্গল পড়ত সেই সময়ের মধ্যে মঙ্গরের পনেরো কাঠা জমি চষা হয়ে যেত, আর তাও এত ভাল করে যে প্রথম চাষেই তার মধ্যে ফাঁক পাওয়া শক্ত। পরদিন কোন ক্ষেতে হাল দিতে হবে সে কথা মঙ্গরকে বলে দেবার প্রয়োজন হয় না, সন্ধ্যা-বেলাতেই সে ক্ষেতের আলগুলো ঘুরে যেত। যে জমিগুলোয় লাঙ্গল দিতে হবে ভোর বেলা হাল নিয়ে ঠিক সেখানে হাজির। কাজের সময় কারো খবরদারি করবার মোটেই দরকার নেই। সাধারণ হাল মজুরদের পেছনে সর্ব্বদা যেমন লাঠি নিয়ে লেগে থাকতে হয় এবং তা সত্বেও তারা কাজে ঢিলে দেয়, গড়িমসি করে, আজকের কাজটা কালকের জন্য ফেলে রাখে—এ সব অভ্যাস মঙ্গরের একেবারেই ছিল না। ক্ষেতে খাড়া ফসলেরই হোক, শুকনো ঘাসেরই হোক আর খামারে আঁটি বেঁধে জমা করা শস্যই হোক, মঙ্গরের ওপর পাহারার ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুম দেওয়া যায়।

তা ছাড়া এমন 'জন' কোথায় পাওয়া যাবে ? সুতরাং তার কদর হবে নাই বা কেন ? আমার ঠাকুর্দা মশাই বলতেন, 'মঙ্গর হালচাষা নয় রে, ও একটা দৈত্য।' ঠিক দৈত্যের মতই যেন কখনও কখনও সে বেঁকে বসত যে, কড়া কড়া কথা শোনাত। সে সময় তার কড়া কথাগুলো গায়ে না মেখে বরং তাকে প্রসন্ন করবার জন্য রীতিমত সাধ্য সাধনা করতে হ'ত।

কখনও বা ব্যাপারটা আরো দূর পর্যন্ত গড়াত। একদিনের কথা —খুব বকাবকি হয়ে গেল। পরদিন ভোর বেলায় মঙ্গর হাল নিতে এল না, এ তরফ থেকে কেউ ডাকতেও গেল না।—'পয়সা দেব, কত জন খাটবে—ভাবনা কিসের ?'—নতুন হাল চাষা এনে জমি চাষ হ'ল। আবার ও দিকেও অন্য কিষান এসে মঙ্গরকে বলল—'মঙ্গর দেখ্ ওরা অন্য জন এনে লাঙ্গল দেওয়াচ্ছে। ওদের যেমন পয়সা আছে হাজারো জন পাবে, তেমনি তোরও গতর আছে তোরও হাজারো কাজ মিলবে। চল্, আমার হাল দিবি, যা মজুরী চাইবি তাই দেবো।' কিন্তু সে গেল না, তার নাকি মাথা ধরেছে। আর সেই 'মাথা ধরা' রয়েই গেল যতদিন না আমার কাকা ঘাট মেনে তাকে নিজে ডাকতে গেলেন। চার দিনেই মঙ্গরের কদর বেশ বুঝে গেছেন। বলদগুলোর কাঁধ ছিলে গেছে, তাদের পায়ে ফালের চোট লেগেছে। ক্ষেতে লাঙ্গল তো দেওয়া হয়েছে কিন্তু মাটি ভেঙ্গে ঢেলাও হয়নি আর মেশেওনি, এর ওপর আবার ক্ষেতের আলের ওপর বসে সারাদিন টিক টিক করা। এত কাণ্ড করে তবে কোন রকমে দিনে দশ কাঠা জমি চষা হবে।—মঙ্গর না হলে কাজ চলবে না।

কাকা তার দোরের কাছে দাঁড়িয়েছেন, মঙ্গর ঘরের মধ্যে বসে। মঙ্গরের অর্দ্ধাঙ্গিনী ভকোলিয়া বলল : 'মালিক দাঁড়িয়ে, যাও কাজে যাও—।'

'বলে দে, আমার মাথা ধরেছে—' মঙ্গর কাকাকে শুনিয়ে বললে।

'বাবু, গিন্নিমার কাছ থেকে এক চাপড়া তেল নিয়ে ওর মাথায় দিয়ে দেবেন—' —ভকোলিয়া হেসে বললে।

'আমার সঙ্গে ঠাট্টা হচ্ছে?'—মঙ্গরের কণ্ঠে বিরক্তি।

'মঙ্গর চল, নিজেদের মধ্যে একটু আধটু এমন হয়েই থাকে, ক্ষমা দাও—' কাকার কণ্ঠে মিনতি।

'যান বাবু চার দিন যাকে দিয়ে হাল দিইয়েছেন তাকে দিয়েই দেওয়ান গে। আমায় নিয়ে গিয়ে আর কি হবে? আধখানা রুটি আপনাদের বেঁচে যাবে।'

এইভাবে এক পক্ষে রোখ ঝোঁক আর অপর পক্ষে অনুনয় বিনয়। অবশেষে দেখা গেল পাচন বাড়ি নিয়ে আগে আগে চলেছে মঙ্গর, আর পেছনে পেছনে কাকা।

'আধখানা রুটি বাঁচার' অর্থ আপনাদের বোধগম্য হ'ল কি? এটি মঙ্গরের একটী বিশেষ ব্যবস্থা বলে ধরে নিতে পারেন। গ্রামে আর সব হাল মজুরদের জন্য বরাদ্দ একখানা করে রুটি, কিন্তু মঙ্গরের জন্য দেড়খানা। আবার সে রুটিও হওয়া চাই গমের আটার, সেঁকা হওয়া চাই ঠিক মত। সে রুটির ওপর চাই একটু তরকারী, কারণ মঙ্গর কারো 'কাঁচা নিমক' খায় না। মঙ্গরের সব শর্তই মঞ্জুর।

কিন্তু এ দেড়খানা রুটি যে সে নিজে খেত এ যেন মনে করবেন না।—তা হলে কি নিজের অর্দ্ধাঙ্গিনীর জন্য বেঁধে আনত? না, তাও নয়। সেই আধখানা রুটি দু ভাগ করে বলদ দুটোকে খাওয়াত। অর্থাৎ সেই আধখানা রুটি আবার আমাদের ঘরেই ফিরে আসত। কিন্তু তবু এ ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি হবার জো ছিল না। '—মহাদেব মুখের দিকে চেয়ে থাকবে, আর আমি খাব?' তা কি করে হতে

পারে ? বলদগুলো মঙ্গরের কাছে বলদ নয় তো যেন সাক্ষাৎ মহাদেব ছিল।

এক আধবার ঝগড়া যখন আরও দূর গড়িয়েছে তখন মঙ্গর গ্রাম ছেড়েই চলে গেছে, কিন্তু গ্রামে থেকে সে কখনও অন্য কিষানের জমিতে হাল দেয়নি। অন্য গ্রামেও তার মন বসেনি। তখন আবার আর এক গ্রামে গেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঘুরে ফিরে আবার আমাদের গাঁয়েই ফিরে এসেছে। বোধহয় এই জন্য যে আমাদের বাড়ির মত আদর আর সে কোথাও পায়নি।

মঙ্গরের প্রকৃতি ছিল রুক্ষ, নীরস। কারো সঙ্গে মাখামাখি নেই, কাউকে খোশামোদও নেই। কট কট করে কথা বলে কিন্তু কাজ ষোলো আনা খাঁটি।

তবু কি জানি কেন মঙ্গর প্রথম থেকেই আমায় একটু স্নেহের চক্ষে দেখত। আমার বাবা তাকে বড় ভালবাসতেন সেই জন্যই বোধহয়। এখনও বলে—'মানুষ ছিলেন আমাদের মেজবাবু, তিনি মারা গেলেন, আর আমার কপালও ভাঙ্গল।' আর আমি শৈশব থেকেই মাতৃ-পিতৃহীন বলেও বোধহয়। মা গেলেন, বাবাও গেলেন। এই জন্যই সে তার কাঁধে আমায় চড়তে দিয়েছিল। একটু বড় হলে যখন মামার বাড়িতে যাওয়া আসা করতাম তখন মঙ্গরই আমায় সেখানে পৌঁছে দিত। আমি একটা ছোট ঘোড়ায় সওয়ার, আর মামার বাড়ির জন্য কিছু জিনিসপত্র, আমার খাতা বই মাথায় নিয়ে লাগাম ধরে আগে আগে যেত মঙ্গর। পথে উঁচু নীচু জমি পড়লে আমার পাশে এসে এক হাতে আমায় ধরে থাকত, পাছে আমি ঘোড়া থেকে পড়ে যাই। তার বলিষ্ঠ হাতের সেই কোমল স্পর্শ যেন আমি এখনও অনুভব করতে পারি।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কমে যেতে লাগল। মঙ্গরের ভাষায়—আমি নিজের বাড়িতেই অতিথির মত হয়ে গেলাম। কিন্তু যখনই দু-চার দিনের জন্য বাড়ি আসতাম মঙ্গরের সেই একই রূপ দেখেছি—সেই এক কাজই তাকে করতে দেখেছি।

কাপড়ের সঙ্গে মঙ্গরের বিশেষ সদ্‌ভাব নেই। কোমরে কৌপিন মাত্র থাকে। ধুতি সে পেত প্রত্যেক বছর গোবর্দ্ধন পূজার দিন—নতুন ধুতি না নিয়ে বলদের শিংয়ে মালা পরাবার পাত্রই সে নয়। এ ছাড়াও বাবা, কাকা তাতে প্রায়ই পুরনো ধুতি দিতেন। বাড়িতে বিবাহাদি উপলক্ষ্যে তার জন্য লাল ধুতি বরাদ্দ ছিল। আমার বিয়ের সময় মঙ্গরের জন্য পাঞ্জাবীও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ধুতিগুলো চিরদিনই তার শিরোভূষণ হয়ে থাকত, সেগুলোকে মঙ্গর পাগড়ির মত করে মাথায় জড়িয়ে রাখত। আমাদের কুটুম-বাড়ি কোন সামাজিকতার কাজে যখন তাকে পাঠান হ'ত, কেবল তখন তার অঙ্গটি ঢাকা পড়ত। আর না হলে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থাতেই থাকত সে। তার সেই অনাবৃত দেহখানি আমার খুব ভাল লাগত। আজ আমার এই শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে বলতে পারি মঙ্গরের দেহ প্রকৃতই সুন্দর ছিল।

কাল কুচ্‌কুচে—সে আবার সুন্দর কি! সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি যাদের কাছে ফরসা রঙ আর সাজ-সজ্জা, তাদের রুচির প্রতি আমার কোন আস্থা নেই; এবং এই উদ্ধত মতবাদের জন্য আমি আজও কারো কাছে মাথা নামিয়ে ক্ষমা চাইতে রাজী নই। মঙ্গরের সেই কালো দেহটি পরিপূর্ণ, সুবিকশিত মানব-শরীরের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অবিচ্ছিন্ন শারীরিক পরিশ্রমে তার মাংসপেশীগুলো স্বভাবতঃই ফুলে থাকত। পালোয়ানদের মত তার শরীরে অস্বাভাবিক পেশী স্ফুরণ ছিল না। তার জঙ্ঘা, বক্ষস্থল, হাত দুখানা, শরীরের প্রত্যেক অংশেই ঠিক প্রয়োজন

মত পেশীর স্ফূরণ হয়েছিল—মাত্রা কোথাও ছাড়ায় নি। কোথাও মাংসের আধিক্য নেই, আবার শুকনো কাঠও নয়। সুগঠিত দেহের ওপর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রূপে যেন তার সাধারণ মাথাটা বসান। মঙ্গরের দেহ দেখে আমার মনে পড়ে প্রাকৃতিক ব্যায়ামবিদ্ মিষ্টার মুলারের আকৃতি। স্যাণ্ডো-প্রেমিকরা মঙ্গরকে দেখে নিরাশ হবেন এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই

কিন্তু আজ আর সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। সে মঙ্গর আর নেই। নিজের তেজ দিয়ে দারিদ্র্যকে চিরদিন সে দাবিয়ে রেখেছিল। কিন্তু বার্দ্ধক্যের প্রহার থেকে মুক্তি পেল না। তার এক একটি আঘাতে ধীরে ধীরে সে জর্জ্জরিত হয়েছে। আজ তাকে দেখে মনে হয় : 'হাড় গেল শুকিয়ে, শরীর হ'ল ভারী,

এর ওপর আর কি চাপাবে ব্যাপারী !'[১]

কেবল যে তার দেহের মাংস ও পেশীগুলোই গলেছে তা নয়, তার হাড়গুলোও যেন শুকিয়ে গেছে। আজকের এই শরীরটা মঙ্গরের বিগত দিনের শরীরের একটা ব্যঙ্গচিত্র। বার্দ্ধক্যের প্রহারকে প্রতিহত করবার জন্য যে বস্তু ঢালের কাজ করে সে বস্তু মঙ্গর সঞ্চয় করেনি। 'আজ খায় আর কালকের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে চায় তাকে বাবা গোরখনাথ সঙ্গে রাখেন না।'[২] এই মন্ত্রের উপাসক মঙ্গর সঞ্চয়ের ঘোর বিরোধী। বৃদ্ধাবস্থার অবলম্বন একটা ছেলেও নেই তার। নিরস্ত্র অরক্ষিত যোদ্ধার ওপর বার্দ্ধক্যের সব আঘাতই বর্ষিত হয়েছে। বুড়ো

---

১ সুখী হাড় ঠাঠ ভঈ ভারী
অব ক্যা লাদোগে ব্যাপারী।

২ আজ খায় কল কো ঝখ্‌খে
তাকো গোরখ সঙ্গ ন রখ্‌খে।

হয়েছে তাই মঙ্গর হাল মজুরের কাজ আর করতে পারে না। কিছুদিন তাকে দিয়ে এটা ওটা করিয়ে নেওয়া হল, কিন্তু তাও বেশীদিন চলল না। কেবল একটি উপায়ই হতে পারত—তাকে পেন্সন হিসাবে কিছু দেওয়া। কিন্তু প্রকৃত অন্নদাতা এই হাল মজুরদের জন্য এ অভাগা দেশে পেন্সনের ব্যবস্থা কোথায়? ব্যক্তিগত দয়ার গণ্ডী চিরদিনই ছোট। এ ছাড়া—মঙ্গরের প্রকৃতিতে আছে পোড়ান দড়ির তাপ আর শক্ত পাক, চিরদিনই কৃপার বর্ষণ ওর কাছ থেকে দূরে দূরেই রয়ে গেছে। দয়ার মেঘের জন্য চাই আশীর্বচনের শীতল স্তর,—অথচ মঙ্গরের অভিধানে ঐ বস্তুটির একান্তই অভাব। উপরন্তু আজও সেই রস-কস-হীন কথাবার্তা, তেতে ওঠা মেজাজি আঁচ—যাতে জল তো জল, রক্ত পর্যান্ত শুকিয়ে যায়। এ সত্ত্বেও যদি বা কখন স্বাতী নক্ষত্রের জল-বিন্দুর মত উদারতার এক আধ ফোঁটা জল ঝরে—তাতে পাপিয়ার পিপাসা নিবৃত্তি হলেও হতে পারে কিন্তু মঙ্গরের বার্দ্ধক্যের মরুভূমি-সিঞ্চন হয় না। এ কথা জোর করে বলতে বাধা নেই যে মঙ্গরের অর্দ্ধাঙ্গিনী না থাকলে তার এ কঙ্কালটার চিহ্নও থাকত না।

তার অর্দ্ধাঙ্গিনী ভকোলিয়া মঙ্গরের যোগ্য সঙ্গিনী। সেই কালো-জামের মত গায়ের রঙ—কালো বলে তাকে অপমান করতে ইচ্ছা হয় না। কেবল দুটী সন্তান হয়েছিল তাই তার নারীত্বের অনেকটা এক মহান ক্ষয়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল—সে ক্ষয়ের একটা সুমিষ্ট নাম দেওয়া হয়েছে 'মাতৃত্ব'। মঙ্গর জরাজীর্ণ হয়ে গেছে কিন্তু ভকোলিয়া এখনও চলা ফেরা করে। নিজের হাত পায়ের জোরে কিছু না কিছু অন্ন সংস্থান করতে পারে, তাতে দুটী প্রাণীর ভরণপোষণ হয়ে যায়। কিন্তু তাই বা আর কতদিন? সে বেচারীও তো দিন দিন জীর্ণ হয়ে পড়ছে।

মঙ্গরের যোগ্য সঙ্গিনী ভকোলিয়া—কেবল শারীরিক ধাঁচেই নয়, প্রকৃতিতেও। সে এক দিন ছিল যখন ভকোলিয়া মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলত, ফির্‌কে হাঁটত। চট করে যেমন কারো সঙ্গে মাখামাখি করত না তেমনি কারো রোয়াবও বরদাস্ত করত না। তাকে রাগান মানে কালনাগিনীর ফণায় পা দেওয়া। তবে সে কেবল ফোঁস করে উঠত, দংশন বা বিষের আরোপ করলে তার প্রতি বিশেষ অবিচার হবে।

কিন্তু পুরুষদের তুলনায় স্ত্রীলোক শীঘ্র নিজেকে পরিবেশের ছাঁচে ঢেলে নিতে পারে—ভকোলিয়া তারই প্রমাণ। মঙ্গর আজও সেই মঙ্গর আর তার সেই মুখচোপা, কিন্তু ভকোলিয়া সে ভকোলিয়া আর নেই। লোকের ছেলে খেলা দিয়ে, ছাঁটা পেষা করে দিয়ে, ঘুঁটে দিয়ে, জল তুলে দিয়ে যা পায় তা দিয়ে আগে মঙ্গরকে খাওয়ায় তারপর নিজে খায়। এত করেও দিন রাত মঙ্গরের খোঁটা খায়। মঙ্গর যেন তার চিরদিনের স্বভাবের তিক্ততা—সংসারের সমস্ত ঝাল এখন তার ওপরই ঝাড়ে।

'সবই ভগবানের ইচ্ছা' এই বলে মঙ্গর যার নাম নিয়ে নিজের কষ্ট ভুলতে চেষ্টা করত, সেই ভগবানই গত বৎসর তার আরও দুর্গতি করলেন। তার ভয়ানক আধকপালে হল, ভকোলিয়া তার চিৎকারে বিগলিত হয়ে কোন দয়ালু প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটু দারচিনি চেয়ে এনে ছাগলের দুধ দিয়ে বেটে তার কপালে প্রলেপ দিয়ে দিল।

'বাঁ চোখের পাতার ওপর আর রগে লাগিয়ে দে'—মঙ্গর প্রলেপের প্রথম স্নিগ্ধতা অনুভব করে বললে। ভকোলিয়া তার নির্দেশ পালন করল। কিন্তু তারপর এ কি হ'ল? প্রলেপ দেওয়া জায়গাগুলোয় ভয়ানক জ্বালা আরম্ভ হ'ল, সেই জ্বালা ঘায়ে পরিণত হ'ল, আর সেই ঘায়ে তার একটা চোখও গেল। আমি যখন বাড়ি এলাম মঙ্গর কাঁদতে

লাগল—'বাবু আমার একটা চোখ গেছে—আমি কানা হয়ে গেছি বাবু—!'

বোধহয় এই প্রথমবার আমি মঙ্গরকে কাঁদতে দেখলাম। তাকে আমি সান্ত্বনা দিতে লাগলাম কিন্তু আমার মনে যে কি হচ্ছিল……।

বিপদ কখনও একা আসে না।

গত মাঘে আমি বাড়ি গেলাম। ভোর বেলা। রোদ বেরিয়েছে কিন্তু নিজের চিরদিনের অভ্যাস মত আমি চোখ বুজে লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি। মাঝে মাঝে যেন কোন জিনিস পড়ে যাওয়ার মত শব্দ পেতে লাগলাম। লেপ থেকে মুখ বার করে চোখ খুললাম। দেখলাম সামনে জমা করা খড়ের স্তূপের কাছে একটা কৃষ্ণবর্ণ হাড়-পাঁজরা-সার মূর্ত্তি বারবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে আর পড়ে যাচ্ছে। কে—মঙ্গর, না? শুনেছিলাম মঙ্গরের একদিক পক্ষাঘাতে পড়ে গেছে। বললাম: 'মঙ্গর, শুয়ে থাকিস না কেন—কত চোট লাগছে দেখ দেখি।'

'শুয়ে শুয়ে প্রাণটা ছটফট করে বাবু'—মঙ্গর উত্তর দিল।

ওঃ, শিরাগুলো আলগা হয়ে গেছে, রক্তের ধারা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও যেন তাতে ঢেউ আসে আর সেই ঢেউগুলো যেন শুষ্ক সাগরের বালুতটের ওপর মাথা খুঁড়ে, আছাড় খেয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। বড়ই করুণ দৃশ্য।

রূপার ঠাকুমা

খানিক বেলা হতেই স্কুল থেকে ফিরে আমি উঠোনে বাবু হয়ে বসে দই চিঁড়ের গ্রাস মুখে তুলেই চলেছি এমন সময় হঠাৎ মামী আমার থালা তুলে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। অবাক হয়ে তাঁর পেছনে পেছনে আমিও ঘরে এলাম। থালা রেখে তিনি বল্লেন : 'এইখানে বসে খা, বাইরে বার হসনে, রূপার ঠাকুমা আসছে, নজর দিয়ে দেবে। বুঝেছিস তো ?'

আমি ছাই বুঝলাম! তবে রূপার ঠাকুমাকে ভয় না করে কে ? তার বড় বড় চোখ দুটো দেখে কোন ছেলে না শিউরে উঠবে ? সে ডাইনী—এ কথা সারা গ্রামের লোকে জানে। সে যাকে ইচ্ছা তাকে যাদুর একটী ফুঁয়ে মেরে ফেলতে পারে। বাচ্চাদের ওপর তার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি! কত শিশুকে, কত হাসছে খেলছে এমন ছেলেকে সে তার ঐ বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে গিলে খেয়েছে। মস্ত বড় দুটো চোখ!

রূপার ঠাকুমা। লম্বা ফরসা, মুখখানা বেশ পুরন্ত। সর্বদাই সাদা ধপধপে কাপড় পরনে। সেই সাদা কাপড়ের মধ্যে দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব যেন জ্বল জ্বল করত। আর তার সেই বড় বড় চোখ একটু লালচে রঙের। সারা দেহ পুরুষ ছাঁচে তৈরি, যেন ভুলে স্ত্রীলোক হয়ে গেছে। লোকে বলে যে-গ্রাম থেকে সে এসেছে সেখানে স্ত্রীলোকদের রাজ্য। কত লোকে তার শ্বশুরকে বারণ করেছিল ছেলের বিয়ে সেখানে দিতে। কিন্তু তিনিও ছিলেন তেমনি একগুঁয়ে। জেদ চড়ে গেল তাঁর—দেখি কিরকম হয় সেখানকার মেয়ে।

রূপার ঠাকুমা বৌ হয়ে এল। সে আসবার অল্পদিনের মধ্যেই শ্বশুর মারা গেলেন। কিছুদিন পরে রূপার ঠাকুর্দাও গেলেন। এদের মৃত্যু হয়েছিল অদ্ভুত রকমের। শ্বশুর দুপুর বেলা ক্ষেত থেকে এলেন, রূপার

ঠাকুমা তাঁর সামনে ভাতের থালা ধরে দিল। দু গ্রাস খেতে না খেতেই পেটে খোচ ব্যথা, খুব যন্ত্রণা, খাওয়া ছেড়ে উঠে গেলেন। সন্ধ্যা হতে হতে সেই যন্ত্রণাতেই তাঁর মৃত্যু হ'ল। রূপার ঠাকুর্দা কার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন, ফিরলেন ক্লান্ত। তাঁর নববিবাহিতা পত্নী—রূপার ঠাকুমা হেসে এক গ্লাস জল দিল তাঁকে। জল খেতেই মাথা ঘুরে গেল, জর এল। সেই জ্বরেই তিন দিনের মধ্যে তাঁরও মৃত্যু হল।

প্রথম ঘটনা থেকেই ফিসফাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, দ্বিতীয় ঘটনায় পুরোপুরি সিদ্ধান্ত হল রূপার ঠাকুমা ডাইনী, সেই ওদের দুজনকে খেয়েছে।

রূপার বাবার জন্ম হল তার চেয়ে তিন চার মাস পরে। রূপার ঠাকুমার কোল ভরল, 'ডাইনী নিজের বংশটা রক্ষা করল'—লোকে বলাবলি করলে। ডাইনী নিজের ছেলেকে বড় যত্নে পালন করল, বড় সড় হল সে ছেলে। তারও বিয়ে দিল খুব ধুমধাম করে। কিন্তু কি ভয়ানক ডাইনী। বিয়ের এক বছরের মধ্যে ছেলেকে খেল—গোঁপ উঠেছে, খাসা জোয়ান ছেলে! কি সুগঠিত দেহই ছিল তার। কুস্তী করে বাড়ী এল, মায়ের হাত থেকে গরম দুধ নিয়ে খেল। রক্ত দাস্ত হতে লাগল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই কাবার। তার মৃত্যুর পর এই রূপার জন্ম হল—আঁতুড় ঘরেই তার মা মরে গেল! বাপরে কি ভয়ানক ডান। প্রথমে নিজের ঘরই উজাড় করে ডাইনী।

জোয়ান ছেলে মরার পর রূপার ঠাকুমার এক বিশেষ পরিবর্তন হল। চোখ লাল সর্বদা, সামান্য কথাতে চোখে জল আসত, কি যেন বিড় বিড় করতে থাকে, দু বেলা স্নান করে ভগবতীর মণ্ডপটা নিকোত, ধূপ ধুনো দিত, খুব পরিষ্কার কাপড় পরত, কোন জোয়ান লোক দেখলে চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারত না; শিশুদের দিকে তাকিয়ে থাকত

এমন করে যেন চোখ দিয়েই গিলে খাবে। লোকে বলাবলি করতে লাগল : 'এবার তার ডাইনীর লক্ষণগুলো সব প্রকাশ হয়ে গেছে, পালাও —রূপার ঠাকুমার কবল থেকে পালাও।'

রূপার ঠাকুমার কবল থেকে বাঁচতে হবে। কিন্তু বাঁচা যায় কি করে ? সারা দিন রূপাকে কোলে কাঁধে নিয়ে কখনও বা তার ছোট ছোট আঙ্গুলগুলো ধরে এ গলি থেকে ও গলি, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাওয়া আসা করছেই। একটা ব্রত বাদ যাবার জো নেই, একটা তীর্থ ছাড়বে না। সমস্ত পালপার্বণে, উৎসবে—বিনা নিমন্ত্রণেই সে উপস্থিত! ওঃ এ ডাইনী যে কবে মরবে ? কবে যে এর কবল থেকে গ্রামের লোকের মুক্তি হবে।

কিন্তু সবই মনে মনে। রূপার ঠাকুমা সামনে এলে তখনই তার খোশামোদ আরম্ভ হবে। রেগে না যায় ডাইনী। নিজের শ্বশুর, স্বামী, ছেলে, বৌ খেতে যার দেরী হয় নি পরের ছেলেপুলে খেতে তার ভয় কি ? স্ত্রীলোকেরা তাকে দেখে কেঁপে উঠত। কিন্তু যেমনি সে সামনে এল অমনি 'ঠাকুমা' 'ঠাকুমা' করে তার খাতির-যত্নের কি ঘটা! 'এই-খানে বস' 'একটু তামাক খাও'[১], সুপুরী খাও। অমুক জিনিস কে যেন দিয়েছে একটুখানি খাও।'—এই প্রকার আদর আপ্যায়ন। রূপার ঠাকুমা কখন কিছু গ্রহণ করত, কখন বা অস্বীকার করত। তখন শত আগ্রহ দেখালেও অটল। তার অস্বীকারে লোকের ভয় আরো বেড়ে যেত। তারপর সংসারই তো, বছর, ছ মাসের মধ্যে যদি কারো কিছু হল, দোষ পড়ল রূপার ঠাকুমার ঘাড়ে।

এই ডাইনীকে মারবার জন্য কত ওঝাই এল। তাদের সব কত

১ বিহারে স্ত্রীলোকের হুঁকা টানার রেওয়াজ এখনও আছে

লম্ফ ঝম্প, কেউ বলে ডাইনী তার সামনে ন্যাংটো নাচবে, কেউ বলে তার কাপড়ে আপনা হতেই আগুন জ্বলে উঠবে, ডাইনীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। ডাইনী পাগল হয়ে নিজেই নিজের সব কথা খুলে বলবে।

রোজা এল, তান্ত্রিক এল, যাদু হল, তুকতাক হল। তেলীদের শ্মশানের কাঠ, উড়ুলের ফুল, উলটো সরসের তেল, ব্যাঙের চামড়া, বাঘের দাঁত—কত কিই যে যোগাড় হল। ঢাক বাজল, ঝাঁজ বাজল, গান হল, ভূত এল, কত দেবা দেবী এল! কিন্তু রূপার ঠাকুমা না হল পাগল, না নাচল ন্যাংটো হয়ে। তার দেহে একটি ফোস্কাও পড়ল না। রোজা তান্ত্রিক বলতে বলতে চলে গেল: 'ওঃ কি ভয়ানক ডান। কামরূপ কামাক্ষা না গেলে তার যাদু আর কাটা যাবে না।' কত রোজা এ জন্য টাকা আদায় করে নিল কিন্তু রূপার ঠাকুমা যেমনকে-তেমনই রইল।

আমি বড় হলাম, লেখা পড়া শিখলাম। ইংরেজী বিদ্যা শিখে ভূত-প্রেতের ওপর বিশেষ আস্থা রইল না, যাদু তুকতাকের ওপর বিশ্বাস গেল। আমি বললাম: 'এ সব অন্যায়, রূপার ঠাকুমার ওপর মিথ্যা দোষারোপ হচ্ছে। বেচারীর বাড়িতে একটার পর একটা আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তার মাথার ঠিক নেই। রাঙ্গা চোখ বা চোখে জল ডাইনীর লক্ষণ নয়, এটা তার দুঃখেরই নিদর্শন। শিশুদের দেখে আদর করে, জোয়ান ছেলেদের দেখলে হয় তার নিজের জোয়ান ছেলেকে মনে পড়ে আর নয় এদের দেখে তাকে ভুলতে চেষ্টা করে। পুজো-আর্চা সবই তার জীবনের সেই দুর্ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া। পৃথিবীতে ভূত বলে কিছুই নেই, যাদু তুকতাক সমস্ত বাজে।'—কিন্তু শোনে কে আমার এ সব কথা। একদিন মামী আমার কথা শুনে বললেন: 'হাঁ হাঁ, তোমার আর কি? তোমার কাছে যাদু তুকতাক সবই তো মিথ্যে।

ভগবান তোমায় চিরজীবী করুন। কিন্তু ডাইনী যাদের কোল শূন্য করেছে, যাদের জ্যান্ত ছেলেকে চিবিয়ে খেয়েছে, যাদের হাসা-খেলা সংসারকে শ্মশান করে দিয়েছে—তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।'

বলতে বলতেই তাঁর চোখে জল। উষ্ণ অশ্রুবিন্দু দু চোখ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে।—তিনি বল্লেন এক প্রতিবেশিনীর কাহিনী: 'সেই প্রতিবেশিনীর মেয়ে ছেলে কোলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এল। একদিন তার সেই ছ' বছরের নাতি উঠোনে লাফালাফি করছে। কি রূপই ছিল ছেলেটার। যেন বিধাতা নিজের হাতে গড়েছেন। যে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। ক'দিন আমাদের বাড়ি এসেছিল,—জোর করে আমার কাঁধে চড়ল, দই চেয়ে খেল। আধো আধো কথা, চকচকে সাদা দুধে দাঁতগুলো—হাসলে যেন আলো হয়ে যেত। কথা বলত যেন শিউলী ঝরত! আর এমন ছেলেকে······

'একদিন সে ছেলে উঠোনে, এমন সময় ডাইনী সেখানে হাজির। ঠিক সেই রকম চোখে জলের ধারা, ঠোঁট কাঁপছে, রূপার হাত ধরে। তাকে দেখেই ছেলের মায়ের মুখ শুকিয়ে আমসি, দিদিমা ভয়ে ব্যাকুল, ছেলেকে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে ছেলে লুকোবার মতও তো নয়। দুরন্ত দামাল ছেলে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ডাইনীর কাঁধে চড়ে বসল। কাঁধে চড়ে তার চুল ছিঁড়ছে, গলা ধরে দোল খাচ্ছে, নিজের ছোট ছোট গোড়ালিগুলো দিয়ে তাকে মারছে। ছেলের এই সব দুরন্তপনায় ডাইনী হেসে ফেলল।—সেই নাকি প্রথমবার লোকে তাকে হাসতে দেখল। তার পর সে নিজে ঘোড়া হল, ছেলেটা হল তার সওয়ার। অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়া ঘোড়া খেলা হল—ছেলেকে হাসাল, কত খেলা দিল। বার বার তাকে বুকে চেপে ধরে বলে "এমন ছেলে আর দুটি দেখিনি।···ওঃ আমার···" কথা আর শেষ হয় না,

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তাকে কাঁদতে দেখে ছেলেটাই সুড়সুড়ি দিয়ে, হেসে, ভুলিয়ে তার কান্না থামাল।

'ডাইনী আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি গেল "যুগ যুগ আয়ু হোক তোমার ছেলের। তোমার কোল চিরদিন এমনি জুড়ে থাক, এমনি সোনার চাঁদ ছেলে তোমার আরও হোক"। মা তো অবাক—দিদিমার যেন এতক্ষণে দেহে প্রাণ এল।

'—কিন্তু তারপর কি হল জান? কিছুদিন পরেই ছেলেটাকে এমন রোগে ধরল যে সে শুকিয়ে গেল। কোথায় গেল তার সে রূপ; তার সেই দুরন্তপনা—তার হাসি সব শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেল। দিন রাত চিঁ চিঁ করে—যে দেখে তারই চোখে জল এসে যায় ছেলেটার অবস্থা দেখে। তারপর একদিন চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে · সে···

'সেদিন যদি ছেলের মাকে দেখতে তুমি। বেচারী পাগল হয়ে গিয়েছিল। ছেলের মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে আছে কিছুতেই ছাড়ে না। কার ক্ষমতা তার কাছ থেকে ছেলে নেয়? চোখের জল শুকিয়ে জ্বলে গেছে, তার চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে। ছেলেকে বুকে চেপে আছে যেন দুধের শিশু। অর্থহীন কথা বলছে, ছেলের মুখে মাই দেবার চেষ্টা করছে। তাকে নীরব দেখে কখন কখন চিৎকার করে উঠছে। শুনে মনে হচ্ছিল যেন তার কল্‌জে ফেটে যাচ্ছে, যারা শুনেছে তাদেরও বুক ফেটেছে।······'

কাহিনী শুনতে শুনতে আমি দেখছি আজও মামীর বুক ফাটছে। কাহিনীর শেষ হ'ল কোন শব্দে নয়, চোখের জলের জোয়ারে।

তা ছাড়া মামীর ছেলেও তো সেই খেয়েছে। মুখে বলেন না মামী, কিন্তু তাঁর চেহারার করুণ ভাব-ভঙ্গী, এক এক বিন্দু অশ্রু যেন এই কথাই বলছে—'হতভাগী ডাইনীর ছেলে খেয়েও হল না—মামীর

কোলে আবার ছাই ভরে দিল। তারপর থেকে একটি ছেলেও হল না। কত কাণ্ড করে যদি বা হল তাও দু দুটো মেয়ে।'

মামীর কথা ছেড়ে দাও, একদিন মামাও আমার তর্ক শুনে রাগ করলেন—তাঁর নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনা বললেন :

'ঐ উঁচু ঢিবিটা দেখছ? ঐখানে এক দোসাধের[২] ঘর ছিল। বুড়ো হয়েছিল। তার দু দুটো জোয়ান ছেলে, ঘরে বৌ, ছেলেদের বৌরা—সব ছিল। দুটো ছেলেই খুব রোজগেরে। বলিষ্ঠ, জোয়ান ছেলে দুটো, বুড়ো নিজেও চটপটে কাজের। অল্পদিনেই গ্রামে তার খুব চাহিদা হল—হাতের জোর ছিল কিনা। কাজ করত—খেত। স্বভাবও ভাল। কারো সাথে ঝগড়াঝাটি নেই—সকলকে খুশী রাখতে চেষ্টা করত, সকলের কাজ করে দিত।

'একদিন বুড়ি—ঐ রূপার ঠাকুমা—সেখানে গিয়ে হাজির, বলল : "আমার একটু কাজ করে দাও আজ।" বুড়ো তাকে দেখে প্রণাম করল। বসতে কুশাসন পেতে দিল। বুড়ি বসল না, বলল : "দোসাধের ছোঁয়ায় হাড় পর্যন্ত অপবিত্র হয়, আমি তো বামুনের ঘরের বৌ!" বুড়ো কিছুই বললে না, কেবল মিনতি করে বললে : "আজ তো অপর লোকের কাজ করব কথা দিয়ে এসেছি, কাল আপনার কাজ করে দেব।" বুড়ি জেদ করতে লাগল, না আজই তার কাজ হওয়াই চাই।

'এদের কথার মধ্যেই বড় ছেলেটা বলে উঠল "দোসাধের ছোঁয়ায় হাড় পর্যন্ত অপবিত্র হয়—আর ঘর ছোঁয়া যাবে না?" আর যায় কোথায়, বুড়ি রেগে আগুন—তাকে নাকি অপমান করা হয়েছে—তার ছেলে নেই

২ দোসাধ—কথিত নিম্ন জাতি বিশেষ

বলে তাকে ভয় নেই। তারও যদি ছেলে থাকত···ইত্যাদি। প্রথমে গর্জন তারপর আরম্ভ হল বর্ষণ। বুড়ো দোসাধ অবাক। হাত জোড় করে মিনতি করল—"এখনই যাচ্ছি, আপনার কাজ আগে করব। অন্যের কাজ কালকে হবে। আজই আপনার কাজ করছি।" কিন্তু বুড়ি সেখানে এক মিনিট দাঁড়াল না—বাড়ীর পথ ধরল।'

'এই পথেই সে যাচ্ছিল'—মামা বলতে লাগলেন: 'আমি দেখলাম বিড় বিড় করতে করতে যাচ্ছে—আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে—চোখ দুটো লাল। পেছনে পেছনে বুড়ো দৌড়োচ্ছে। বুড়োকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে সে সব কথা বলল। সে কাঁপছিল, "বাবু ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, কি জানি কি হয়?"

'বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তোমার ইংরেজী বিদ্যা এর কি অর্থ করবে,—কিন্তু সেই রাত্রেই বুড়োর বড় ছেলেকে সাপে কামড়াল।

'ভোর বেলা। হায়রে! গিয়ে দেখলাম অমন জোয়ান ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সারা দেহ হলদে, মুখ থেকে গ্যাঁজলা উঠছে। কত গাঁ থেকে সাপের রোজারা এসেছে। কেউ জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে, কেউ চাবুক পটকাচ্ছে, কেউ বা শেকড়-বুটি বেটে খাওয়াবার চেষ্টা করছে, কেউ তার নাকে কিছু শোঁকাবার চেষ্টা করছে। থেকে থেকে সে চোখ মেলে চাইছে, হাত পা ছুঁড়ছে, আবার নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার নিস্তব্ধতা ক্রমশঃ নিস্পন্দতায় পরিণত হচ্ছে আর সেই নিস্পন্দতা ক্রমশঃ নির্জীবতায়। বুড়ো বাপ বুক চাপড়াচ্ছে, ছোট ভাই ডুক্‌রে কাঁদছে। মা আর স্ত্রীর কথা আর কি বলা যায়। রোজারা বলল: "আমরা কি করব? সাপের বিষই নামাতে পারি, এ তো মানুষের বিষ! স্পষ্টই যাদু, ঠিক মাঝরাতে লেগেছে যাদু। নামে যদি, সে ভাগ্যের কথা—" বুড়োর সে ভাগ্য হল না। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের

সামনে দিয়ে মড়া ঘাটে নিয়ে গেল। পরদিন বুড়ো তার সমস্ত পরিবার নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

'ওরে এ বুড়ি মানুষ নয়, এ হল সাক্ষাৎ কাল। একটা পেত্নী, একটা সাপ! চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ও বামনী, না হলে ওকে জ্যান্ত পুতলেও কোন পাপ হয় না।'

আমি নীরব। ভাবাবেগের ওপর যুক্তির প্রভাব হয় কোথায়?

* * *

শিবরাত্রির মেলা। অপার ভিড়। ছেলে বুড়ো জোয়ান, মেয়ে পুরুষ কেউ আর বাদ নেই। শিবের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে, অক্ষত বেলপত্র, ফুল ফল চড়ান হচ্ছে। তার ওপর কেবল একটি দিনের জন্য মেলা বসেছে, ঘোরো ফেরো, কেনো কাটো। ঠেলাঠেলির অন্ত নেই। চলবার দরকার নেই, কেবল ভিড়ের মধ্যে জুটে গেলেই হল, নিজে নিজেই কোন একটা কিনারায় গিয়ে থামবে। ছোট ছেলে আর মেয়েদের ভিড়ই বেশী। তাদেরই কেনবার মত জিনিসপত্র বেশী। খঞ্জনী, বাঁশী, ঝুনঝুনি, মাটির পুতুল, রবারের খেলনা, ন্যাকড়ার পুতুল, রঙ্গীন্ মিষ্টি, বিস্কুট, লজঞ্জুস। কপালের টিপ, সিঁদুর, চুড়ী, রেশমের গোছা, নকল গোটছড়া, রাংতা, আয়না, চিরুণী, সাবান, সস্তার সেণ্ট আর রঙ্গীন্ পাউডার। দর কষাকষির কি ঘটা, গোলমাল হৈ চৈ। গহনার ঝম্‌ঝম্, চুড়ীর ঝুন্‌ঝুন্, সাড়ীর খস্‌খস্ আর তার সঙ্গে হাসির খিল্‌খিল্ সব একসঙ্গে মিলে গেছে।

কোথাও নাচ হচ্ছে, কোথাও বহুরূপী সং সেজেছে, নাগরদোলায় চেপে ছেলেমেয়েরা খুশী মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অকস্মাৎ একদিক থেকে চিৎকার উঠল 'পাগলী' 'পাগলী' 'পাগলী' 'ছাড়ো' 'ছাড়ো' 'মারো' 'মারো' 'মারো'—

একটি স্ত্রীলোক দৌড়ে পালাচ্ছে, অর্ধনগ্ন, অর্ধমৃত, লোকেরা তার পেছনে পেছনে তাড়া করছে। ব্যাপার কি ?

এক যুবতী মেলায় এসে তার শিশুকে নিজের সখীর জিম্মায় দিয়ে কেনাকাটা করতে গেছে। সখী কিছু চঞ্চল প্রকৃতি আর শিশু তো চিরদিনই চঞ্চল। লালছড়ীওয়ালার—'মেরে লাল ছড়ী আলবাত্তা, বেচুঙ্গা মৈঁ কলকাত্তা' শুনে সখী তার জিম্মার কথা ভুলে গেছে। এদিকে শিশু তার আঙ্গুল ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বার হয়ে ঝুনঝুনি-ওয়ালার কাছে পৌছেছে। লাল ছড়ীওয়ালার দিক থেকে সখীর যখন শিশুর দিকে খেয়াল হ'ল—দেখে নেই। সে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগল। দেখে এক বুড়ি সেই শিশুকে কোলে করে ঝুনঝুনি দিচ্ছে আর মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। কি তার মূর্তি, শতছিন্ন কাপড়, ধূলিমলিন দেহ, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ দুটো রাঙ্গা, ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা হাত পা, তাকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল 'ডাইনী'। বুড়ি চমকে ফোঁস করে উঠল 'কি বল্লি ?'

কিন্তু সে চেঁচিয়েই যাচ্ছে—'ডাইনী—ডাইনী'। গোলমাল শুনে শিশু কাঁদতে আরম্ভ করল। বুড়ি এবার শিশুকে কাঁধে নিল। দেখেই সে বুড়ির কাছে এসে শিশুটিকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। একটা গোলমাল উঠল, একটা চিৎকার, একটা গোঙ্গানি। এবার দেখা গেল শিশুটি সেই সখীর কোলে, আর বুড়িকে লোকেরা মারছে। শিশুটি বার বার তার দিকে চেয়ে 'বুদিয়া' 'বুদিয়া' বলছে অর্থাৎ তাকে প্রহার করা হচ্ছে দেখে তার দয়া হচ্ছে—সে বুড়ির কোলে যেতে চায়। কিন্তু তার দিকে তখন তাকাবে কে ?

বুড়ি পালাচ্ছে—তার পেছনে তাড়া করছে মেয়ে পুরুষ বালকের দল। খানিকটা দূরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও রাগ করে দাঁত

কিড়মিড় করছে, কখনও জোড় হাতে মিনতি করছে, কখনও বা রাগ করে ঢিল তুলছে। সে তো কেবল ঢিল তুলছে কিন্তু লোকেরা তাকে ঢিল দিয়ে মারছে। এই ভাবে পালাতে পালাতে সে এমন একটা জায়গায় পৌছাল যেখানে একটা কূয়ো ছিল,—এখন পাড় ভেঙ্গে কূয়োটা ধসে যাচ্ছে। পালাতে ব্যস্ত বুড়ির আর কিছুই ভাববার ক্ষমতা নেই। ধড়াস করে কূয়োটার মধ্যে পড়ে গেল সে!

ভিড় থমকে দাঁড়াল। কেউ বলল 'মরতে দাও ওটাকে', কেউ বলল 'বার কর'। নিষ্ঠুরতার ওপর করুণা জয়ী হতে হতে তার জলসমাধি হয়ে গেল।

এই সেই লাশ। বুড়ি রূপার ঠাকুমার লাশ।

সে এখানে কেমন করে এল? সমস্ত জমিজমা বেচে রূপার বিয়ে দিয়েছিল খুব ধুমধাম করে। যেদিন ভোরে পালকী চড়ে রূপা শ্বশুর-বাড়ি বিদায় হয়ে গেল সেইদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেল। কোথায় কে জানে? কে জানে কত ঘাটের জল খেয়ে আজ মেলায় পৌছেছে। কেন? রূপাকে দেখবার জন্য—তার ছেলেকে দেখবার জন্য। শিশুটি কি রূপার ছেলে? —সে পরিচয় দিল না কেন?

ছেড়ে দেওয়া যাক ও কথা।

অনেক দিন হল রবিবাবুর একটি গল্প পড়েছিলাম। এক ভদ্র পরিবারের মহিলার কলেরায় মৃত্যু হল। শবদাহ করবার জন্য লোকেরা দেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। চিতা সাজান হচ্ছে এমন সময় বর্ষা সুরু হল। চিতা ছেড়ে লোকেরা কাছেই একটা আমবাগানের মধ্যে চালাঘরে আশ্রয় নিল। অন্ধকার রাত্রি। বর্ষণশেষে তারা ফিরে এসে দেখে মৃতদেহ নেই। শেয়ালে খেল নাকি! সব অনুসন্ধান ব্যর্থ হল। কিন্তু নিজেদের অসাবধানতায় মৃতদেহ হারিয়ে গেছে এ কথা বাবুর কাছে

বলা যাবে কি করে ? তারা শূন্য চিতায় আগুন দিয়ে ফিরে গেল। এদিকে সেই ভদ্রমহিলা বর্ষার জল পেয়ে জ্ঞান ফিরে পেলেন, চিতা থেকে উঠে এলেন। ভদ্র ঘরের বৌ ছিলেন, সারাদিন ক্ষেতে লুকিয়ে রইলেন। রাত্রে বাড়ি পৌছে দোরের কড়া নাড়লেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে লোকেরা 'ভূত ভূত' করে দৌড়ে পালাল। বাপের বাড়ি গেলেন সেখানেও 'ভূত ভুত', বোনের বাড়ি গেলেন সেখানেও 'ভূত ভূত'। শেষ অবধি তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন !

রূপার ঠাকুমার অপবাদ এই প্রকার নয় কি ? ঘটনা পরম্পরা তার সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, আর লোকেরা করেছিল জল্লাদের কাজ।

দেব

তপেসর দা'র বাগানে বিলাতী পেয়ারার একটা গাছ ছিল। তার প্রথম কলম বিলাত থেকে এসেছিল, না অন্য কোথাও থেকে তা আমি বলতে পারব না। কোন নতুন ধরনের জিনিস—বিশেষ করে তার জাত—ক্ষুদ্র আকারের হলে—গ্রামে প্রায়ই তাকে 'বিলাতী' বলে, এ আমি দেখেছি। ছোট কুকুর বিলাতী কুকুর, টম্যাটোর নাম হয়েছে বিলাতী বেগুন।

এই বিলাতী পেয়ারার গাছটা সাধারণ পেয়ারা গাছের চেয়ে ছোট। গাছের ডালপালাগুলো পলকা ও নমনীয়। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, খুব চিকন ও ছোট ছোট। ফলগুলোর আকৃতি বড় সুপারীর চেয়ে বড় নয়। পাকলে রং হয় দুধের মত সাদা, কিন্তু শাঁস টুকটুকে লাল।

আমরা ছেলেবেলায় কি ভাবে গাছটার ওপর হানা দিতাম আর

আমাদের খপ্পর থেকে তপেসর দা' গাছটাকে কি ভাবে যে বাঁচাতেন সে এক কাহিনী।

'দেব, দেখেছ কি রকম পেকেছে বিলাতী পেয়ারাগুলো'

'বল তো পেড়ে নিয়ে আসি।'

'বাপ রে, তপেসর দা' ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে।'

'যাঃ, ভারী ঠ্যাং ভাঙ্গবার মুরোদ।'

সে তীরের মত শন্ শন্ করে ছুটল। গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে ঘাপটি মেরে, কোথাও বা ঝুঁকে উপুড় হয়ে প্রায় বুকে হেঁটে এগিয়ে যায় দেব। আস্তে আস্তে পৌঁছায় বিলাতী পেয়ারা গাছটার তলায়। তারপর বাঁদরের মত—না, কাঠবিড়ালীর মত সর্ সর্ করে গাছে চড়ে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সে তার ছোট ছোট হাত দিয়ে খুব চটপট পাকা পাকা পেয়ারাগুলো ছিঁড়ছে। এদিকে আমার জিভ সজল।

লাভ যত হয় লোভও ততই বেড়ে যায়। দেব ধীরে ধীরে সরু থেকে আরো সরু ডালে যাচ্ছে—আমি সেইদিকেই তাকিয়ে আছি। সে হাত বাড়িয়ে একটা পেয়ারা পাড়ছে এমন সময় তার পায়ের নীচের ডালটা মচ্ করে ভেঙ্গে গেল। ওপরের যে ডালটা বাঁ হাতে ধরেছিল সেটা তার সম্পূর্ণ ভার সইতে পারল না। ওকে নিয়ে সেটাও ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

আর এদিকে গাছের ডাল ভাঙ্গার মড় মড় শব্দ শুনে ছড়ি হাতে তপেসর দা' নিজের চালাঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। পড়ে গিয়ে দেবের এক মুহূর্তও দেরি হ'ল না, সে নিমেষের মধ্যে চম্পট দিল। বুড়ো তপেসর দা' আর কাঁহাতক তার সঙ্গে দৌড়বেন। গালি দিতে দিতে বাগানে ফিরলেন।

আমি অন্য পথ দিয়ে গিয়ে দেবের সঙ্গে মিললাম। তার কোটের দু পকেট থেকে পাতা সুদ্ধ পাকা পেয়ারা উঁকি মারছে। 'নাও, খাও' সে নিজের হাত পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে।

'এ কি ?'

দেখি, তার বাঁ হাতটা নির্জীবের মত ঝুলে আছে—কনুইএর হাড়টা নেবে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতটা দু টুকরো হয়ে গেছে যেন, কেবল চামড়ার সাহায্যে জোড়া রয়েছে। পালাবার ঝোঁকে দেব হাতের দিকে খেয়ালও করেনি। আমি ভাবলাম এবার এদিকে তার নজর পড়েছে, যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠবে—কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র শিউরে উঠল। একবার উঃ আঃ পর্যন্ত করল না। পেয়ারাগুলোর দিকে ইশারা করে আমায় বলল : 'পকেট থেকে বার করে নাও।' আমি পেয়ারা বার করব কি, কাঁপতে কাঁপতে বললাম : 'দেব তোমার বাঁ হাতটা ভেঙ্গে গেছে।'

বেপরোয়ার মত উত্তর দিল : 'জুড়ে যাবে'—আর আমার গামছাটা দেখিয়ে বলল : 'একটু এইটার সঙ্গে লাগিয়ে এটা আমার গলায় ঝুলিয়ে দাও।'

ভাঙ্গা হাতটা গামছায় জড়িয়ে থলির মত করে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে আমার কত কষ্ট হ'ল কিন্তু সে একটিবার উঃ পর্যন্ত করল না, তবে তার চোখ দুটো রাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম : 'তুমি কি দেব ! যন্ত্রণা হচ্ছে না ?'

'বাঃ, হচ্ছেই তো। কিন্তু চেঁচিয়ে কি হবে ? চেঁচালে যন্ত্রণা কম হয়ে যাবে নাকি ?' তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

*　　*　　*

চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। ক্ষেতে ভুট্টা, সাওয়াঁ, ধান, ভাদোই

হেলছে দুলছে। পথে ঘাটে সর্বত্র ঘাস আর আগাছা মাথা তুলেছে। গাছের-ধোয়া মোছা পাতাগুলো মন হরণ করছে। বাড়িগুলোর চাল লাউ, ঝিঙের লতায় ছেয়ে গেছে।

এই সবুজের সমারোহের মধ্যে জন্মাষ্টমী এসে গেল। আম বাগানে মিঠুয়া, বোম্বাই, মালদা শেষ হয়ে গেছে বটে কিন্তু এখনও ফজলী, ভাদ্র মাসের আম আর রাঢ়ি আম গোছায় গোছায় গাছে ঝুলে আছে। ক্ষেতে ভুট্টার দানায় দুধ ভরে এসেছে। বাগানে পেয়ারার ডালগুলো আর শশার লতাগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। ফল খাবার এমন সুবিধা—আর মাত্র একটি দিনেরই তো ব্রত—সুতরাং ছেলেদের কাছে জন্মাষ্টমীর মত ব্রত আর কি হতে পারে। বলা বাহুল্য আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রতধারী।

বাগানের মাঝখানে যে মন্দিরটা আছে তার মধ্যেই উৎসবের যোগাড়যন্ত্র হচ্ছিল। লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। নানা-রকম প্রসাদ তৈরি করা হচ্ছে। পঞ্জনী—ধনে ভেজে গুঁড়িয়ে মিষ্টি মসলা তৈরির সোঁদা গন্ধে আমরা পাগল হয়ে উঠেছি। মন্দিরের কাছেই একটা গাছে দোলনা টাঙ্গিয়ে খুব দুলছি আমরা। কখন যে সূর্য্যাস্ত হবে, চাঁদ উঠবে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবেন আর আমরা খাব্‌লা খাব্‌লা করে সেই মিষ্টি মসলা খেতে পাব, কেবল এই ভেবে আমরা অধীর হয়ে উঠছি।

সাত আট জন ছেলে আমাদের দলে, দু একটী মেয়েও ছিল। দেবও ছিল। সে ছাড়া গাছে চড়ে দড়ি বা ঝোলাবে কে, আর এত জোরে দোলই বা দেবে কে?

খুব জোরে দোল খাওয়া চলেছে। এর সঙ্গে হাসি, কখনও হুল্লোড়। 'সাপ সাপ'—একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। বাগানের সঙ্গে লাগোয়া

যে বাঁশঝাড়টা ছিল তাতে এক জোড়া গোখ্‌রো থাকে, এ কথা প্রায়ই শোনা যেত ; কিন্তু এই ভরা দুপুর বেলা এত লোক জমা হয়ে চেঁচামেচি গোলমাল করছি—সেখানে তখন সাপ বেরোবে, এ তো কল্পনাই করা যায় না। মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠামাত্র আমাদের নজর পড়ল যেদিকে তার কম্পিত তর্জ্জনী প্রসারিত। 'বাপরে'—সকলের মুখে একই শব্দ, কেউ কেউ তো দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাল। আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গেছি।

সম্ভবত ভাদ্রমাসের মেঘবিহীন সূর্য্যের প্রখর তাপে ব্যাকুল হয়ে সাপটা নিজের গর্ত থেকে কোথাও নিশ্চিন্ত ঠাণ্ডা জায়গার খোঁজে চলছিল। যখন কয়েকজন ছেলে চিৎকার করে ছুটে পালাল তখন সেই চিৎকার শুনে সাপটা থমকে দাঁড়াল, আর মাথাটা তুলে আমাদের ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল। উঃ, কি তার আকৃতি! দৈর্ঘ্যে আড়াই হাতের কম নয়। পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে তার ওপর যে রোদ পড়ছিল তাতে তার ফিকে হলদে রঙ-এর দেহটা যেন ঝক্‌ঝক্ করে উঠছিল। ফণা তুলে সাপটা দাঁড়িয়ে গেল। ফণাটা চার ইঞ্চির কম চওড়া নয়। তার সুন্দর মদালস চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে। জিভটা লক্‌লক্ করছে।

কি করা যায় এ প্রশ্ন মনে আসার আগেই দেখি, দেব একটা লাঠি নিয়ে সেটার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি তাকে বাধা দিতে গেলাম। শুনেছিলাম, পৃথিবীতে কেবল সাড়ে তিন বীর আছে। প্রথম বীর মোষ, দ্বিতীয় শূয়োর, তৃতীয় গোখ্‌রো সাপ আর এদের অর্দ্ধেক বীর রাজা রামচন্দ্র। মোষ, শূয়োর আর গোখ্‌রো সামনা-সামনি লড়াই করে, কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। রাজা রামচন্দ্র বীর ছিলেন বটে কিন্তু বালীকে মারবার জন্য তিনি গাছের আড়াল নিয়েছিলেন। রাজা

রামচন্দ্রের চেয়েও বীর এমন যে গোখ্‌রো সাপ, তাকে কি না ঘাঁটাতে যাচ্ছে আমাদের এতটুকু বন্ধু দেব!

'ছেড়ে দাও ওটাকে—পালাও' আমি চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছি, দেখি দেব তখন সাপটার কাছ থেকে মোটে এক লগি দূরে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথমে সাপটা ফণা নামিয়ে নিয়েছিল, আমি ভাবলাম এবার সেটা পালাবে। কিন্তু তা নয়, যেমনি দেব তার কাছ থেকে এক লগির মধ্যে এসে পড়েছে অমনি সেটা প্রায় এক হাত উচুতে তুলল তার মাথা, ফণাটা যথাসাধ্য চওড়া করে একবার ফোঁস করে উঠল—কালীয় নাগ হয়ত এমনি করেই শ্রীকৃষ্ণের ওপর ফোঁস করে উঠেছিল। ফোঁস ফোঁস করছে আর অনবরত মাথা দোলাচ্ছে—যেন রাগে কাঁপছে।

'দেব, পালাও—।' কিন্তু সে সাপটার ফণার দিকে চোখ রেখে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাপটা এক ইঞ্চি এগোচ্ছে না, আর দেবও এক পা আগে বা পেছনে হটছে না। এ দিকে আমি তো ঘেমে নেয়ে উঠেছি। গোখরোটার চোখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেব।

'পালাও' আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম। সেই মুহূর্তে দেখি দেব নিজের লাঠি বাগিয়েছে—পলক না ফেলতেই ছোট লাঠিটা এমন হিসাব করে ফেলল যে সেটা খুব জোরে—সাপের ফণাটার নিচে, জমি থেকে প্রায় এক বিঘত ওপরে—ঠিক সাপটার গলায় চোট দিয়েছে। এত জোরে লাঠিটা পড়েছে যে সাপটা ফণা শুদ্ধ একবার উল্টে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার সামলে নিয়ে দাঁড়াল। এবার তার লেজটার সামান্য অংশ শুধু মাটির ওপর, বাকী সমস্তটা খাড়া হয়ে গেছে, সেটা ফণা তুলে দুলতে লাগল আর ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। যেন সাক্ষাৎ যমরাজ তাণ্ডব নৃত্য করছেন। দেবের হাত খালি—বুঝলাম সাপটা

যদি তার ওপর পড়ে তাহলে আর তাকে নড়তে হবে না। কিন্তু এত সাহসও আমাদের কারো নেই যে দেবকে বাঁচাবার জন্য যমরাজের মুখে এগিয়ে যাবে। দেব দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে যায় নি তো? 'পালাও পালাও'—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু হঠাৎ দেখি সাপটা নিজে থেকেই এমন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল যে পট করে একটা শব্দ হল। পড়ে গিয়ে সেটা অনবরত মাটিতে লেজ আছড়াতে লাগল আর মাথাটা সামান্য তুলে তুলে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সেটাকে পড়ে যেতে দেখে আমাদের কয়েক জনের সাহস ফিরে এল, গুলিডাণ্ডা খেলবার ডাণ্ডাগুলো নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম যে প্রথম লাঠির চোট এমন মারাত্মক ভাবে লেগেছিল যে, সাপটার গলার হাড় ভেঙ্গে গেছে, কেবল রাগের ঝোঁকে সেটা মাথা তুলে ফণা দুলিয়ে ছিল। কিন্তু রাগের জোরে কতক্ষণ আর ভাঙ্গা হাড় খাড়া থাকতে পারে? সেটা এবার পড়ে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার জন্য যেন মাথা খুঁড়ছে। এগিয়ে যেতে দেখে দেব আমাদের আটকাল, আর আমাদেরই ডাণ্ডা নিয়ে সে নিজে সাপটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে মেরে ফেলল। প্রথমে দূর থেকেই দুতিন ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারল, তারপর কাছে গিয়ে ঘা কয়েক দিল। শেষে লাঠির একটা প্রান্ত সাপটার মুখের কাছে নিয়ে যেতে সাপটা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি কামড়ে ধরে, দেবের খিল খিল করে কি হাসি! অনেকক্ষণ ধরে এই মৃত্যু-ক্রীড়া চলল। এমন সময় দেবের বাবাকে একদিক থেকে আসতে দেখা গেল। তাঁর কাসি শুনে দেব সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি লাঠির ঘায়ে সাপটার মাথাটা ভেঙ্গে থেঁতলে দিয়ে বিজয় উল্লাসে সেখান থেকে চলে গেল, আমরাও তার সঙ্গ নিলাম।

দেবের বাবার ইচ্ছা ছিল দেব পড়াশোনা করে। গ্রামের স্কুলের পড়া কোন প্রকারে শেষ করে সে সহরের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে বেশী দিন টিকতে পারল না।

গ্রামে ফিরে সে নিজের ঘরগৃহস্থালীতে লেগে গেল। তার চরিত্রের পরিণতি হল বড়ই অদ্ভুত। কেউ যদি তার সঙ্গে লাগত সে একেবারে জ্বলে উঠত। কথা কাটাকাটি হলে সে হাত তুলত আর ঠ্যাঙ্গার জবাব সে লাঠি দিয়ে দিত—এই ছিল তার ধরণ। চার পেয়ে মোষই হোক আর দু পেয়ে মানুষই হোক—যার সঙ্গে একবার লেগে গেল, না মেরে তাকে ছাড়া দেয় নি। গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে উচু বাঁশের ডগা পাড়তো সে, সবচেয়ে উচু ডালের ফলটি লাগত তার ভোগে। তার মোষের ভাগ্যে চিরদিন সবুজ ফসল, আর তার বলদ বিনা বন্ধনেই পরের ক্ষেতে চরে বেড়াত। কারো ক্ষেত উজাড় করছে করুক, দেবের সে জন্য কোন পরোয়া নেই। তার সঙ্গে ঝগড়া করে এমন স্পর্দ্ধা কার?

তার চরিত্র সম্বন্ধে মসীমলিন কাহিনীও ছিল। কিন্তু কেন জানি না, আমি চিরদিনই তার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। কত দিন মামা বকেছেন: 'ওর সঙ্গে মেলামেশা কথাবার্ত্তা কর কেন? সে বদমাইস, বদ চরিত্রের ছেলে। তুমি লেখাপড়া কোরছ, ও সব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল নয়।'

তিনি রেগে বকাবকি করলে আমি চুপ করে যেতাম। তাঁর অভিযোগের সত্যতা বা ঔচিত্য সম্বন্ধে আমার দ্বিমত ছিল না। কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও আমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারতাম না। কেন? তখন এ কেনর বিচার করবার অভ্যাসও ছিল না।

এক দিন সন্ধ্যার সময়। আমি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম। প্রকৃতির প্রতি স্বাভাবিক টানে গ্রামের বাহিরে চলে গেছি। পথে দেবের সঙ্গে

লম্ফ ঝম্প, কেউ বলে ডাইনী তার সামনে ন্যাংটো নাচবে, কেউ বলে তার কাপড়ে আপনা হতেই আগুন জ্বলে উঠবে, ডাইনীর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। ডাইনী পাগল হয়ে নিজেই নিজের সব কথা খুলে বলবে।

রোজা এল, তান্ত্রিক এল, যাদু হল, তুকতাক হল। তেলীদের শ্মশানের কাঠ, উড়ুলের ফুল, উলটো সরসের তেল, ব্যাঙের চামড়া, বাঘের দাঁত—কত কিই যে যোগাড় হল। ঢাক বাজল, ঝাঁজ বাজল, গান হল, ভূত এল, কত দেবা দেবী এল! কিন্তু রূপার ঠাকুমা না হল পাগল, না নাচল ন্যাংটো হয়ে। তার দেহে একটি ফোস্কাও পড়ল না। রোজা তান্ত্রিক বলতে বলতে চলে গেল : 'ওঃ কি ভয়ানক ডান। কামরূপ কামাক্ষা না গেলে তার যাদু আর কাটা যাবে না।' কত রোজা এ জন্য টাকা আদায় করে নিল কিন্তু রূপার ঠাকুমা যেমনকে-তেমনই রইল।

আমি বড় হলাম, লেখা পড়া শিখলাম। ইংরেজী বিদ্যা শিখে ভূত-প্রেতের ওপর বিশেষ আস্থা রইল না, যাদু তুকতাকের ওপর বিশ্বাস গেল। আমি বললাম : 'এ সব অন্যায়, রূপার ঠাকুমার ওপর মিথ্যা দোষারোপ হচ্ছে। বেচারীর বাড়িতে একটার পর একটা আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তার মাথার ঠিক নেই। রাঙ্গা চোখ বা চোখে জল ডাইনীর লক্ষণ নয়, এটা তার দুঃখেরই নিদর্শন। শিশুদের দেখে আদর করে, জোয়ান ছেলেদের দেখলে হয় তার নিজের জোয়ান ছেলেকে মনে পড়ে আর নয় এদের দেখে তাকে ভুলতে চেষ্টা করে। পূজো-আর্চা সবই তার জীবনের সেই দুর্ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিয়া। পৃথিবীতে ভূত বলে কিছুই নেই, যাদু তুকতাক সমস্ত বাজে।'—কিন্তু শোনে কে আমার এ সব কথা। একদিন মামী আমার কথা শুনে বললেন : 'হাঁ হাঁ, তোমার আর কি? তোমার কাছে যাদু তুকতাক সবই তো মিথ্যে।

ভগবান তোমায় চিরজীবী করুন। কিন্তু ডাইনী যাদের কোল শূন্য করেছে, যাদের জ্যান্ত ছেলেকে চিবিয়ে খেয়েছে, যাদের হাসা-খেলা সংসারকে শ্মশান করে দিয়েছে—তাদের গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।'

বলতে বলতেই তাঁর চোখে জল। উষ্ণ অশ্রুবিন্দু দু চোখ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে।—তিনি বল্লেন এক প্রতিবেশিনীর কাহিনী : 'সেই প্রতিবেশিনীর মেয়ে ছেলে কোলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এল। একদিন তার সেই ছ' বছরের নাতি উঠোনে লাফালাফি করছে। কি রূপই ছিল ছেলেটার। যেন বিধাতা নিজের হাতে গড়েছেন। যে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। ক'দিন আমাদের বাড়ি এসেছিল,—জোর করে আমার কাঁধে চড়ল, দই চেয়ে খেল। আধো আধো কথা, চকচকে সাদা দুধে দাঁতগুলো—হাসলে যেন আলো হয়ে যেত। কথা বলত যেন শিউলী ঝরত! আর এমন ছেলেকে······

'একদিন সে ছেলে উঠোনে, এমন সময় ডাইনী সেখানে হাজির। ঠিক সেই রকম চোখে জলের ধারা, ঠোঁট কাঁপছে, রূপার হাত ধরে। তাকে দেখেই ছেলের মায়ের মুখ শুকিয়ে আমসি, দিদিমা ভয়ে ব্যাকুল, ছেলেকে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে। কিন্তু সে ছেলে লুকোবার মতও তো নয়। দুরন্ত দামাল ছেলে, তাড়াতাড়ি দৌড়ে এসে ডাইনীর কাঁধে চড়ে বসল। কাঁধে চড়ে তার চুল ছিঁড়ছে, গলা ধরে দোল খাচ্ছে, নিজের ছোট ছোট গোড়ালিগুলো দিয়ে তাকে মারছে। ছেলের এই সব দুরন্তপনায় ডাইনী হেসে ফেলল।—সেই নাকি প্রথমবার লোকে তাকে হাসতে দেখল। তার পর সে নিজে ঘোড়া হল, ছেলেটা হল তার সওয়ার। অনেকক্ষণ ধরে ঘোড়া ঘোড়া খেলা হল—ছেলেকে হাসাল, কত খেলা দিল। বার বার তাকে বুকে চেপে ধরে বলে "এমন ছেলে আর দুটি দেখিনি।···ওঃ আমার···" কথা আর শেষ হয় না,

ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। তাকে কাঁদতে দেখে ছেলেটাই সুড়সুড়ি দিয়ে, হেসে, ভুলিয়ে তার কান্না থামাল।

'ডাইনী আশীর্বাদ করতে করতে বাড়ি গেল "যুগ যুগ আয়ু হোক তোমার ছেলের। তোমার কোল চিরদিন এমনি জুড়ে থাক, এমনি সোনার চাঁদ ছেলে তোমার আরও হোক"। মা তো অবাক—দিদিমার যেন এতক্ষণে দেহে প্রাণ এল।

'—কিন্তু তারপর কি হল জান? কিছুদিন পরেই ছেলেটাকে এমন রোগে ধরল যে সে শুকিয়ে গেল। কোথায় গেল তার সে রূপ; তার সেই দুরন্তপনা—তার হাসি সব শুকিয়ে কাঁটা হয়ে গেল। দিন রাত চিঁ চিঁ করে—যে দেখে তারই চোখে জল এসে যায় ছেলেটার অবস্থা দেখে। তারপর একদিন চোখের জলের বন্যা বইয়ে দিয়ে·· সে···

'সেদিন যদি ছেলের মাকে দেখতে তুমি। বেচারী পাগল হয়ে গিয়েছিল। ছেলের মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে আছে কিছুতেই ছাড়ে না। কার ক্ষমতা তার কাছ থেকে ছেলে নেয়? চোখের জল শুকিয়ে জলে গেছে, তার চোখে আগুন ঠিকরোচ্ছে। ছেলেকে বুকে চেপে আছে যেন দুধের শিশু। অর্থহীন কথা বলছে, ছেলের মুখে মাই দেবার চেষ্টা করছে। তাকে নীরব দেখে কখন কখন চিৎকার করে উঠছে। শুনে মনে হচ্ছিল যেন তার কল্‌জে ফেটে যাচ্ছে, যারা শুনেছে তাদেরও বুক ফেটেছে।······'

কাহিনী শুনতে শুনতে আমি দেখছি আজও মামীর বুক ফাটছে। কাহিনীর শেষ হ'ল কোন শব্দে নয়, চোখের জলের জোয়ারে।

তা ছাড়া মামীর ছেলেও তো সেই খেয়েছে। মুখে বলেন না মামী, কিন্তু তাঁর চেহারার করুণ ভাব-ভঙ্গী, এক এক বিন্দু অশ্রু যেন এই কথাই বলছে—'হতভাগী ডাইনীর ছেলে খেয়েও হল না—মামীর

কোলে আবার ছাই ভরে দিল। তারপর থেকে একটি ছেলেও হল না। কত কাণ্ড করে যদি বা হল তাও দু দুটো মেয়ে।'

মামীর কথা ছেড়ে দাও, একদিন মামাও আমার তর্ক শুনে রাগ করলেন—তাঁর নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনা বললেন:

'ঐ উঁচু ঢিবিটা দেখছ? ঐখানে এক দোসাধের[২] ঘর ছিল। বুড়ো হয়েছিল। তার দু দুটো জোয়ান ছেলে, ঘরে বৌ, ছেলেদের বৌরা—সব ছিল। দুটো ছেলেই খুব রোজগেরে। বলিষ্ঠ, জোয়ান ছেলে দুটো, বুড়ো নিজেও চটপটে কাজের। অল্পদিনেই গ্রামে তার খুব চাহিদা হল—হাতের জোর ছিল কিনা। কাজ করত—খেত। স্বভাবও ভাল। কারো সাথে ঝগড়াঝাঁটি নেই—সকলকে খুশী রাখতে চেষ্টা করত, সকলের কাজ করে দিত।

'একদিন বুড়ি—ঐ রূপার ঠাকুমা—সেখানে গিয়ে হাজির, বলল: "আমার একটু কাজ করে দাও আজ।" বুড়ো তাকে দেখে প্রণাম করল। বসতে কুশাসন পেতে দিল। বুড়ি বসল না, বলল: "দোসাধের ছোঁয়ায় হাড় পর্যন্ত অপবিত্র হয়, আমি তো বামুনের ঘরের বৌ!" বুড়ো কিছুই বললে না, কেবল মিনতি করে বললে: "আজ তো অপর লোকের কাজ করব কথা দিয়ে এসেছি, কাল আপনার কাজ করে দেব।" বুড়ি জেদ করতে লাগল, না আজই তার কাজ হওয়াই চাই।

'এদের কথার মধ্যেই বড় ছেলেটা বলে উঠল "দোসাধের ছোঁয়ায় হাড় পর্যন্ত অপবিত্র হয়—আর ঘর ছোঁয়া যাবে না?" আর যায় কোথায়, বুড়ি রেগে আগুন—তাকে নাকি অপমান করা হয়েছে—তার ছেলে নেই

২ দোসাধ—কথিত নিম্ন জাতি বিশেষ

বলে তাকে ভয় নেই। তারও যদি ছেলে থাকত...ইত্যাদি। প্রথমে গর্জন তারপর আরম্ভ হল বর্ষণ। বুড়ো দোসাধ অবাক। হাত জোড় করে মিনতি করল—"এখনই যাচ্ছি, আপনার কাজ আগে করব। অন্যের কাজ কালকে হবে। আজই আপনার কাজ করছি।" কিন্তু বুড়ি সেখানে এক মিনিট দাঁড়াল না—বাড়ীর পথ ধরল।'

'এই পথেই সে যাচ্ছিল'—মামা বলতে লাগলেন: 'আমি দেখলাম বিড় বিড় করতে করতে যাচ্ছে—আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে—চোখ দুটো লাল। পেছনে পেছনে বুড়ো দৌড়োচ্ছে। বুড়োকে থামিয়ে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে সে সব কথা বলল। সে কাঁপছিল, "বাবু ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করি, কি জানি কি হয়?"

'বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তোমার ইংরেজী বিদ্যা এর কি অর্থ করবে,—কিন্তু সেই রাত্রেই বুড়োর বড় ছেলেকে সাপে কামড়াল।

'ভোর বেলা। হায়রে! গিয়ে দেখলাম অমন জোয়ান ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সারা দেহ হলদে, মুখ থেকে গ্যাঁজলা উঠছে। কত গাঁ থেকে সাপের রোজারা এসেছে। কেউ জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে, কেউ চাবুক পটকাচ্ছে, কেউ বা শেকড়-বুটি বেটে খাওয়াবার চেষ্টা করছে, কেউ তার নাকে কিছু শোঁকাবার চেষ্টা করছে। থেকে থেকে সে চোখ মেলে চাইছে, হাত পা ছুঁড়ছে, আবার নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার নিস্তব্ধতা ক্রমশঃ নিস্পন্দতায় পরিণত হচ্ছে আর সেই নিস্পন্দতা ক্রমশঃ নির্জীবতায়। বুড়ো বাপ বুক চাপড়াচ্ছে, ছোট ভাই ডুক্‌রে কাঁদছে। মা আর স্ত্রীর কথা আর কি বলা যায়। রোজারা বলল: "আমরা কি করব? সাপের বিষই নামাতে পারি, এ তো মানুষের বিষ! স্পষ্টই যাদু, ঠিক মাঝরাতে লেগেছে যাদু। নামে যদি, সে ভাগ্যের কথা—" বুড়োর সে ভাগ্য হল না। দেখতে দেখতে আমাদের চোখের

সামনে দিয়ে মড়া ঘাটে নিয়ে গেল। পরদিন বুড়ো তার সমস্ত পরিবার নিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

'ওরে এ বুড়ি মানুষ নয়, এ হল সাক্ষাৎ কাল। একটা পেত্নী, একটা সাপ! চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। ও বামনী, না হলে ওকে জ্যান্ত পুতলেও কোন পাপ হয় না।'

আমি নীরব। ভাবাবেগের ওপর যুক্তির প্রভাব হয় কোথায়?

* * *

শিবরাত্রির মেলা। অপার ভিড়। ছেলে বুড়ো জোয়ান, মেয়ে পুরুষ কেউ আর বাদ নেই। শিবের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে, অক্ষত বেলপত্র, ফুল ফল চড়ান হচ্ছে। তার ওপর কেবল একটি দিনের জন্য মেলা বসেছে, ঘোরো ফেরো, কেনো কাটো। ঠেলাঠেলির অন্ত নেই। চলবার দরকার নেই, কেবল ভিড়ের মধ্যে জুটে গেলেই হল, নিজে নিজেই কোন একটা কিনারায় গিয়ে থামবে। ছোট ছেলে আর মেয়েদের ভিড়ই বেশী। তাদেরই কেনবার মত জিনিসপত্র বেশী। খঞ্জনী, বাঁশী, ঝুনঝুনি, মাটির পুতুল, রবারের খেলনা, ন্যাকড়ার পুতুল, রঙ্গীন্ মিষ্টি, বিস্কুট, লজঞ্জুস। কপালের টিপ, সিঁদুর, চুড়ী, রেশমের গোছা, নকল গোটছড়া, রাংতা, আয়না, চিরুণী, সাবান, সস্তার সেণ্ট আর রঙ্গীন্ পাউডার। দর কষাকষির কি ঘটা, গোলমাল হৈ চৈ। গহনার ঝম্‌ঝম্, চুড়ীর ঝুন্‌ঝুন্, সাড়ীর খস্‌খস্ আর তার সঙ্গে হাসির খিল্‌খিল্ সব একসঙ্গে মিলে গেছে।

কোথাও নাচ হচ্ছে, কোথাও বহুরূপী সং সেজেছে, নাগরদোলায় চেপে ছেলেমেয়েরা খুশী মনে ঘুরপাক খাচ্ছে।

অকস্মাৎ একদিক থেকে চিৎকার উঠল 'পাগলী' 'পাগলী' 'পাগলী' 'ছাড়ো' 'ছাড়ো' 'মারো' 'মারো' 'মারো'—

একটি স্ত্রীলোক দৌড়ে পালাচ্ছে, অর্ধনগ্ন, অর্ধমৃত, লোকেরা তার পেছনে পেছনে তাড়া করছে। ব্যাপার কি?

এক যুবতী মেলায় এসে তার শিশুকে নিজের সখীর জিম্মায় দিয়ে কেনাকাটা করতে গেছে। সখী কিছু চঞ্চল প্রকৃতি আর শিশু তো চিরদিনই চঞ্চল। লালছড়ীওয়ালার—'মেরে লাল ছড়ী আলবাত্তা, বেচ্‌ঙ্গা মৈঁ কলকাত্তা' শুনে সখী তার জিম্মার কথা ভুলে গেছে। এদিকে শিশু তার আঙ্গুল ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বার হয়ে ঝুনঝুনি-ওয়ালার কাছে পৌঁছেছে। লাল ছড়ীওয়ালার দিক থেকে সখীর যখন শিশুর দিকে খেয়াল হ'ল—দেখে নেই। সে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে লাগল। দেখে এক বুড়ি সেই শিশুকে কোলে করে ঝুনঝুনি দিচ্ছে আর মিষ্টি খাওয়াচ্ছে। কি তার মূর্তি, শতছিন্ন কাপড়, ধূলিমলিন দেহ, উস্কোখুস্কো চুল, চোখ দুটো রাঙ্গা, ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা হাত পা, তাকে দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল 'ডাইনী'। বুড়ি চমকে ফোঁস করে উঠল 'কি বল্লি?'

কিন্তু সে চেঁচিয়েই যাচ্ছে—'ডাইনী—ডাইনী'। গোলমাল শুনে শিশু কাঁদতে আরম্ভ করল। বুড়ি এবার শিশুকে কাঁধে নিল। দেখেই সে বুড়ির কাছে এসে শিশুটিকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। একটা গোলমাল উঠল, একটা চিৎকার, একটা গোঙ্গানি। এবার দেখা গেল শিশুটি সেই সখীর কোলে, আর বুড়িকে লোকেরা মারছে। শিশুটি বার বার তার দিকে চেয়ে 'বুদিয়া' 'বুদিয়া' বলছে অর্থাৎ তাকে প্রহার করা হচ্ছে দেখে তার দয়া হচ্ছে—সে বুড়ির কোলে যেতে চায়। কিন্তু তার দিকে তখন তাকাবে কে?

বুড়ি পালাচ্ছে—তার পেছনে তাড়া করছে মেয়ে পুরুষ বালকের দল। খানিকটা দূরে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও রাগ করে দাঁত

কিড়মিড় করছে, কখনও জোড় হাতে মিনতি করছে, কখনও বা রাগ করে ঢিল তুলছে। সে তো কেবল ঢিল তুলছে কিন্তু লোকেরা তাকে ঢিল দিয়ে মারছে। এই ভাবে পালাতে পালাতে সে এমন একটা জায়গায় পৌঁছাল যেখানে একটা কূয়ো ছিল,—এখন পাড় ভেঙ্গে কূয়োটা ধসে যাচ্ছে। পালাতে ব্যস্ত বুড়ির আর কিছুই ভাববার ক্ষমতা নেই। ধড়াস করে কূয়োটার মধ্যে পড়ে গেল সে!

ভিড় থমকে দাঁড়াল। কেউ বলল 'মরতে দাও ওটাকে', কেউ বলল 'বার কর'। নিষ্ঠুরতার ওপর করুণা জয়ী হতে হতে তার জলসমাধি হয়ে গেল।

এই সেই লাশ। বুড়ি রূপার ঠাকুমার লাশ।

সে এখানে কেমন করে এল? সমস্ত জমিজমা বেচে রূপার বিয়ে দিয়েছিল খুব ধুমধাম করে। যেদিন ভোরে পালকী চড়ে রূপা শ্বশুর-বাড়ি বিদায় হয়ে গেল সেইদিন সন্ধ্যায় সে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেল। কোথায় কে জানে? কে জানে কত ঘাটের জল খেয়ে আজ মেলায় পৌঁছেছে। কেন? রূপাকে দেখবার জন্য—তার ছেলেকে দেখবার জন্য। শিশুটি কি রূপার ছেলে? —সে পরিচয় দিল না কেন?

ছেড়ে দেওয়া যাক ও কথা।

অনেক দিন হল রবিবাবুর একটি গল্প পড়েছিলাম। এক ভদ্র পরিবারের মহিলার কলেরায় মৃত্যু হল। শবদাহ করবার জন্য লোকেরা দেহ শ্মশানে নিয়ে গেল। চিতা সাজান হচ্ছে এমন সময় বর্ষা সুরু হল। চিতা ছেড়ে লোকেরা কাছেই একটা আমবাগানের মধ্যে চালাঘরে আশ্রয় নিল। অন্ধকার রাত্রি। বর্ষণশেষে তারা ফিরে এসে দেখে মৃতদেহ নেই। শেয়ালে খেল নাকি! সব অনুসন্ধান ব্যর্থ হল। কিন্তু নিজেদের অসাবধানতায় মৃতদেহ হারিয়ে গেছে এ কথা বাবুর কাছে

বলা যাবে কি করে? তারা শূন্য চিতায় আগুন দিয়ে ফিরে গেল। এদিকে সেই ভদ্রমহিলা বর্ষার জল পেয়ে জ্ঞান ফিরে পেলেন, চিতা থেকে উঠে এলেন। ভদ্র ঘরের বৌ ছিলেন, সারাদিন ক্ষেতে লুকিয়ে রইলেন। রাত্রে বাড়ি পৌছে দোরের কড়া নাড়লেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে লোকেরা 'ভূত ভূত' করে দৌড়ে পালাল। বাপের বাড়ি গেলেন সেখানেও 'ভূত ভূত', বোনের বাড়ি গেলেন সেখানেও 'ভূত ভূত'। শেষ অবধি তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন!

রূপার ঠাকুমার অপবাদ এই প্রকার নয় কি? ঘটনা পরম্পরা তার সঙ্গে শত্রুতা করেছিল, আর লোকেরা করেছিল জল্লাদের কাজ।

দেব

তপেসর দা'র বাগানে বিলাতী পেয়ারার একটা গাছ ছিল। তার প্রথম কলম বিলাত থেকে এসেছিল, না অন্য কোথাও থেকে তা আমি বলতে পারব না। কোন নতুন ধরনের জিনিস—বিশেষ করে তার জাত—ক্ষুদ্র আকারের হলে—গ্রামে প্রায়ই তাকে 'বিলাতী' বলে, এ আমি দেখেছি। ছোট কুকুর বিলাতী কুকুর, টমাটোর নাম হয়েছে বিলাতী বেগুন।

এই বিলাতী পেয়ারার গাছটা সাধারণ পেয়ারা গাছের চেয়ে ছোট। গাছের ডালপালাগুলো পলকা ও নমনীয়। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ, খুব চিকন ও ছোট ছোট। ফলগুলোর আকৃতি বড় স্নুপারীর চেয়ে বড় নয়। পাকলে রং হয় দুধের মত সাদা, কিন্তু শাঁস টুকটুকে লাল।

আমরা ছেলেবেলায় কি ভাবে গাছটার ওপর হানা দিতাম আর

আমাদের খপ্পর থেকে তপেসর দা' গাছটাকে কি ভাবে যে বাঁচাতেন সে এক কাহিনী।

'দেব, দেখেছ কি রকম পেকেছে বিলাতী পেয়ারাগুলো'

'বল তো পেড়ে নিয়ে আসি।'

'বাপ রে, তপেসর দা' ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে।'

'যাঃ, ভারী ঠ্যাং ভাঙ্গবার মুরোদ।'

সে তীরের মত শন্ শন্ করে ছুটল। গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে ঘাপটি মেরে, কোথাও বা ঝুঁকে উপুড় হয়ে প্রায় বুকে হেঁটে এগিয়ে যায় দেব। আস্তে আস্তে পৌঁছায় বিলাতী পেয়ারা গাছটার তলায়। তারপর বাঁদরের মত—না, কাঠবিড়ালীর মত সর্ সর্ করে গাছে চড়ে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে সে তার ছোট ছোট হাত দিয়ে খুব চটপট পাকা পাকা পেয়ারাগুলো ছিঁড়ছে। এদিকে আমার জিভ সজল।

লাভ যত হয় লোভও ততই বেড়ে যায়। দেব ধীরে ধীরে সরু থেকে আরো সরু ডালে যাচ্ছে—আমি সেইদিকেই তাকিয়ে আছি। সে হাত বাড়িয়ে একটা পেয়ারা পাড়ছে এমন সময় তার পায়ের নীচের ডালটা মচ্ করে ভেঙ্গে গেল। ওপরের যে ডালটা বাঁ হাতে ধরেছিল সেটা তার সম্পূর্ণ ভার সইতে পারল না। ওকে নিয়ে সেটাও ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল।

আর এদিকে গাছের ডাল ভাঙ্গার মড় মড় শব্দ শুনে ছড়ি হাতে তপেসর দা' নিজের চালাঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন। পড়ে গিয়ে দেবের এক মুহূর্তও দেরি হ'ল না, সে নিমেষের মধ্যে চম্পট দিল। বুড়ো তপেসর দা' আর কাঁহাতক তার সঙ্গে দৌড়বেন। গালি দিতে দিতে বাগানে ফিরলেন।

আমি অন্য পথ দিয়ে গিয়ে দেবের সঙ্গে মিললাম। তার কোটের দু পকেট থেকে পাতা সুদ্ধ পাকা পেয়ারা উঁকি মারছে। 'নাও, খাও' সে নিজের হাত পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে।

'এ কি ?'

দেখি, তার বাঁ হাতটা নির্জীবের মত ঝুলে আছে—কনুইএর হাড়টা নেবে গেছে বলে মনে হচ্ছে। হাতটা দু টুকরো হয়ে গেছে যেন, কেবল চামড়ার সাহায্যে জোড়া রয়েছে। পালাবার ঝোঁকে দেব হাতের দিকে খেয়ালও করেনি। আমি ভাবলাম এবার এদিকে তার নজর পড়েছে, যন্ত্রণায় সে চিৎকার করে উঠবে—কিন্তু সে কেবল নাম মাত্র শিউরে উঠল। একবার উঃ আঃ পর্যন্ত করল না। পেয়ারাগুলোর দিকে ইশারা করে আমায় বলল: 'পকেট থেকে বার করে নাও।' আমি পেয়ারা বার করব কি, কাঁপতে কাঁপতে বললাম: 'দেব তোমার বাঁ হাতটা ভেঙ্গে গেছে।'

বেপরোয়ার মত উত্তর দিল: 'জুড়ে যাবে'—আর আমার গামছাটা দেখিয়ে বলল: 'একটু এইটার সঙ্গে লাগিয়ে এটা আমার গলায় ঝুলিয়ে দাও।'

ভাঙ্গা হাতটা গামছায় জড়িয়ে থলির মত করে তার গলায় ঝুলিয়ে দিতে আমার কত কষ্ট হ'ল কিন্তু সে একটিবার উঃ পর্যন্ত করল না, তবে তার চোখ দুটো রাঙ্গা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম: 'তুমি কি দেব! যন্ত্রণা হচ্ছে না?'

'বাঃ, হচ্ছেই তো। কিন্তু চেঁচিয়ে কি হবে? চেঁচালে যন্ত্রণা কম হয়ে যাবে নাকি?' তার ঠোঁট দুটো কাঁপছিল।

* * *

চারিদিকে সবুজ আর সবুজ। ক্ষেতে ভুট্টা, সাওয়াঁ, ধান, ভাদোই

হেলছে দুলছে। পথে ঘাটে সর্বত্র ঘাস আর আগাছা মাথা তুলেছে। গাছের-ধোয়া মোছা পাতাগুলো মন হরণ করছে। বাড়িগুলোর চাল লাউ, ঝিঙের লতায় ছেয়ে গেছে।

এই সবুজের সমারোহের মধ্যে জন্মাষ্টমী এসে গেল। আম বাগানে মিঠুয়া, বোম্বাই, মালদা শেষ হয়ে গেছে বটে কিন্তু এখনও ফজলী, ভাদ্র মাসের আম আর রাঢ়ি আম গোছায় গোছায় গাছে ঝুলে আছে। ক্ষেতে ভুট্টার দানায় দুধ ভরে এসেছে। বাগানে পেয়ারার ডালগুলো আর শশার লতাগুলো ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। ফল খাবার এমন সুবিধা—আর মাত্র একটি দিনেরই তো ব্রত—সুতরাং ছেলেদের কাছে জন্মাষ্টমীর মত ব্রত আর কি হতে পারে। বলা বাহুল্য আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রতধারী।

বাগানের মাঝখানে যে মন্দিরটা আছে তার মধ্যেই উৎসবের যোগাড়যন্ত্র হচ্ছিল। লোকজনের যাতায়াত লেগেই আছে। নানা-রকম প্রসাদ তৈরি করা হচ্ছে। পঞ্জনী—ধনে ভেজে গুঁড়িয়ে মিষ্টি মসলা তৈরির সোঁদা গন্ধে আমরা পাগল হয়ে উঠেছি। মন্দিরের কাছেই একটা গাছে দোলনা টাঙ্গিয়ে খুব দুলছি আমরা। কখন যে সূর্য্যাস্ত হবে, চাঁদ উঠবে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবেন আর আমরা খাব্‌লা খাব্‌লা করে সেই মিষ্টি মসলা খেতে পাব, কেবল এই ভেবে আমরা অধীর হয়ে উঠছি।

সাত আট জন ছেলে আমাদের দলে, দু একটী মেয়েও ছিল। দেবও ছিল। সে ছাড়া গাছে চড়ে দড়ি বা ঝোলাবে কে, আর এত জোরে দোলই বা দেবে কে?

খুব জোরে দোল খাওয়া চলেছে। এর সঙ্গে হাসি, কখনও হুল্লোড়। 'সাপ সাপ'—একটি মেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। বাগানের সঙ্গে লাগোয়া

যে বাঁশঝাড়টা ছিল তাতে এক জোড়া গোখ্‌রো থাকে, এ কথা প্রায়ই শোনা যেত ; কিন্তু এই ভরা দুপুর বেলা এত লোক জমা হয়ে চেঁচামেচি গোলমাল করছি—সেখানে তখন সাপ বেরোবে, এ তো কল্পনাই করা যায় না। মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠামাত্র আমাদের নজর পড়ল যেদিকে তার কম্পিত তর্জ্জনী প্রসারিত। 'বাপরে'—সকলের মুখে একই শব্দ, কেউ কেউ তো দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাল। আমরা সকলেই ভয় পেয়ে গেছি।

সম্ভবত ভাদ্রমাসের মেঘবিহীন সূর্য্যের প্রখর তাপে ব্যাকুল হয়ে সাপটা নিজের গর্ত থেকে কোথাও নিশ্চিন্ত ঠাণ্ডা জায়গার খোঁজে চলছিল। যখন কয়েকজন ছেলে চিৎকার করে ছুটে পালাল তখন সেই চিৎকার শুনে সাপটা থমকে দাঁড়াল, আর মাথাটা তুলে আমাদের ভাল করে দেখবার চেষ্টা করল। উঃ, কি তার আকৃতি! দৈর্ঘ্যে আড়াই হাতের কম নয়। পাতার ফাঁক দিয়ে দিয়ে তার ওপর যে রোদ পড়ছিল তাতে তার ফিকে হলদে রঙ-এর দেহটা যেন ঝক্‌ঝক্ করে উঠছিল। ফণা তুলে সাপটা দাঁড়িয়ে গেল। ফণাটা চার ইঞ্চির কম চওড়া নয়। তার সুন্দর মদালস চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে। জিভটা লক্‌লক্ করছে।

কি করা যায় এ প্রশ্ন মনে আসার আগেই দেখি, দেব একটা লাঠি নিয়ে সেটার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমি তাকে বাধা দিতে গেলাম। শুনেছিলাম, পৃথিবীতে কেবল সাড়ে তিন বীর আছে। প্রথম বীর মোষ, দ্বিতীয় শূয়োর, তৃতীয় গোখ্‌রো সাপ আর এদের অর্দ্ধেক বীর রাজা রামচন্দ্র। মোষ, শূয়োর আর গোখ্‌রো সামনা-সামনি লড়াই করে, কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে না। রাজা রামচন্দ্র বীর ছিলেন বটে কিন্তু বালীকে মারবার জন্য তিনি গাছের আড়াল নিয়েছিলেন। রাজা

রামচন্দ্রের চেয়েও বীর এমন যে গোখ্‌রো সাপ, তাকে কি না ঘাঁটাতে যাচ্ছে আমাদের এতটুকু বন্ধু দেব !

'ছেড়ে দাও ওটাকে—পালাও' আমি চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছি, দেখি দেব তখন সাপটার কাছ থেকে মোটে এক লগি দূরে। তাকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথমে সাপটা ফণা নামিয়ে নিয়েছিল, আমি ভাবলাম এবার সেটা পালাবে। কিন্তু তা নয়, যেমনি দেব তার কাছ থেকে এক লগির মধ্যে এসে পড়েছে অমনি সেটা প্রায় এক হাত উচুতে তুলল তার মাথা, ফণাটা যথাসাধ্য চওড়া করে একবার ফোঁস করে উঠল—কালীয় নাগ হয়ত এমনি করেই শ্রীকৃষ্ণের ওপর ফোঁস করে উঠেছিল। ফোঁস ফোঁস করছে আর অনবরত মাথা দোলাচ্ছে—যেন রাগে কাঁপছে।

'দেব, পালাও—।' কিন্তু সে সাপটার ফণার দিকে চোখ রেখে লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সাপটা এক ইঞ্চি এগোচ্ছে না, আর দেবও এক পা আগে বা পেছনে হটছে না। এ দিকে আমি তো ঘেমে নেয়ে উঠেছি। গোখরোটার চোখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেব।

'পালাও' আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম। সেই মুহূর্ত্তে দেখি দেব নিজের লাঠি বাগিয়েছে—পলক না ফেলতেই ছোট লাঠিটা এমন হিসাব করে ফেলল যে সেটা খুব জোরে—সাপের ফণাটার নিচে, জমি থেকে প্রায় এক বিঘত ওপরে—ঠিক সাপটার গলায় চোট দিয়েছে। এত জোরে লাঠিটা পড়েছে যে সাপটা ফণা শুদ্ধ একবার উল্টে গেল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার সামলে নিয়ে দাঁড়াল। এবার তার লেজটার সামান্য অংশ শুধু মাটির ওপর, বাকী সমস্তটা খাড়া হয়ে গেছে, সেটা ফণা তুলে দুলতে লাগল আর ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। যেন সাক্ষাৎ যমরাজ তাণ্ডব নৃত্য করছেন। দেবের হাত খালি—বুঝলাম সাপটা

যদি তার ওপর পড়ে তাহলে আর তাকে নড়তে হবে না। কিন্তু এত সাহসও আমাদের কারো নেই যে দেবকে বাঁচাবার জন্য যমরাজের মুখে এগিয়ে যাবে। দেব দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে যায় নি তো? 'পালাও পালাও'—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

কিন্তু হঠাৎ দেখি সাপটা নিজে থেকেই এমন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল যে পট করে একটা শব্দ হল। পড়ে গিয়ে সেটা অনবরত মাটিতে লেজ আছড়াতে লাগল আর মাথাটা সামান্য তুলে তুলে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। সেটাকে পড়ে যেতে দেখে আমাদের কয়েক জনের সাহস ফিরে এল, গুলিডাণ্ডা খেলবার ডাণ্ডাগুলো নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম। বুঝলাম যে প্রথম লাঠির চোট এমন মারাত্মক ভাবে লেগেছিল যে, সাপটার গলার হাড় ভেঙ্গে গেছে, কেবল রাগের ঝোঁকে সেটা মাথা তুলে ফণা দুলিয়ে ছিল। কিন্তু রাগের জোরে কতক্ষণ আর ভাঙ্গা হাড় খাড়া থাকতে পারে? সেটা এবার পড়ে গিয়ে নিজের অসহায় অবস্থার জন্য যেন মাথা খুঁড়ছে। এগিয়ে যেতে দেখে দেব আমাদের আটকাল, আর আমাদেরই ডাণ্ডা নিয়ে সে নিজে সাপটাকে খেলিয়ে খেলিয়ে মেরে ফেলল। প্রথমে দূর থেকেই দুতিন ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারল, তারপর কাছে গিয়ে ঘা কয়েক দিল। শেষে লাঠির একটা প্রান্ত সাপটার মুখের কাছে নিয়ে যেতে সাপটা যখন ক্ষিপ্ত হয়ে লাঠি কামড়ে ধরে, দেবের খিল খিল করে কি হাসি! অনেকক্ষণ ধরে এই মৃত্যু-ক্রীড়া চলল। এমন সময় দেবের বাবাকে একদিক থেকে আসতে দেখা গেল। তাঁর কাসি শুনে দেব সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি লাঠির ঘায়ে সাপটার মাথাটা ভেঙ্গে থেঁতলে দিয়ে বিজয় উল্লাসে সেখান থেকে চলে গেল, আমরাও তার সঙ্গ নিলাম।

দেবের বাবার ইচ্ছা ছিল দেব পড়াশোনা করে। গ্রামের স্কুলের পড়া কোন প্রকারে শেষ করে সে সহরের স্কুলে পড়তে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে বেশী দিন টিকতে পারল না।

গ্রামে ফিরে সে নিজের ঘরগৃহস্থালীতে লেগে গেল। তার চরিত্রের পরিণতি হল বড়ই অদ্ভুত। কেউ যদি তার সঙ্গে লাগত সে একেবারে জ্বলে উঠত। কথা কাটাকাটি হলে সে হাত তুলত আর ঠ্যাঙ্গার জবাব সে লাঠি দিয়ে দিত—এই ছিল তার ধরণ। চার পেয়ে মোষই হোক আর দু পেয়ে মানুষই হোক—যার সঙ্গে একবার লেগে গেল, না মেরে তাকে ছাড়া দেয় নি। গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে উচু বাঁশের ডগা পাড়তো সে, সবচেয়ে উচু ডালের ফলটি লাগত তার ভোগে। তার মোষের ভাগ্যে চিরদিন সবুজ ফসল, আর তার বলদ বিনা বন্ধনেই পরের ক্ষেতে চরে বেড়াত। কারো ক্ষেত উজাড় করছে করুক, দেবের সে জন্য কোন পরোয়া নেই। তার সঙ্গে ঝগড়া করে এমন স্পর্দ্ধা কার?

তার চরিত্র সম্বন্ধে মসীমলিন কাহিনীও ছিল। কিন্তু কেন জানি না, আমি চিরদিনই তার প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। কত দিন মামা বকেছেন: 'ওর সঙ্গে মেলামেশা কথাবার্ত্তা কর কেন? সে বদমাইস, বদ চরিত্রের ছেলে। তুমি লেখাপড়া কোরছ, ও সব ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল নয়।'

তিনি রেগে বকাবকি করলে আমি চুপ করে যেতাম। তাঁর অভিযোগের সত্যতা বা ঔচিত্য সম্বন্ধে আমার দ্বিমত ছিল না। কিন্তু সমস্ত জেনেশুনেও আমি তার সঙ্গ ছাড়তে পারতাম না। কেন? তখন এ কেনর বিচার করবার অভ্যাসও ছিল না।

এক দিন সন্ধ্যার সময়। আমি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলাম। প্রকৃতির প্রতি স্বাভাবিক টানে গ্রামের বাহিরে চলে গেছি। পথে দেবের সঙ্গে

দেখা। আমরা ছুজনে চলতে লাগলাম। দেখি একটা ক্ষেতে রাঙ্গা আলুর লতাপাতাগুলো খুব ঘন হয়েছে। তার ওপর পা রাখতে এত আরাম লাগছে যেন মখমলের ওপর দিয়ে হাঁটছি। লতার মধ্যে কিছু লাল ফুলও ফুটেছিল, যেন সবুজ মখমলের গালিচার ওপর গোলাপ ছড়িয়ে আছে। আমি সেইখানেই বসে পড়লাম। বললাম : 'দেব একটা গান কর।'

'বেশ কথা! গান গাইতে শুনেছ কখন আমায়?'

'আচ্ছা তবে একটা গল্প বল।'

'কি রকম? নিজের জীবনের কোন ঘটনা?'—সে মুখ টিপে হাসল। একটি বিশেষ গুণ দেবের চরিত্রে ছিল—সে কখনও মিথ্যা কথা বলত না। নিজের প্রেমের কাহিনী বলতে লাগল। সবই গ্রাম্য রোমান্স, এবং সেই রোমান্সের অদ্ভুত সব এ্যাডভেঞ্চার। গল্প শুনতে শুনতে কখন যে সূর্য্য অস্ত গেল, কেমন করে অস্তগত সূর্য্যের আলো সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল, বুঝতেই পারলাম না। হঠাৎ অন্ধকার দেখে 'এবার যাওয়া যাক' বলে আমরা উঠে পড়লাম।

খানিকটা পথ সঙ্গেই এলাম। হঠাৎ দেব চুপচাপ হয়ে গেল। তারপর বলল : 'আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে মেলামেশা কর কেন—এ জন্যে তোমার নিন্দে হয় তো?'

'পাগলা, নিন্দের পরোয়া কেন তোমার? এমন কথা বল না।'

সে আবার চুপচাপ। একটু পরে আগ্রহভরা কণ্ঠে বলল : 'আচ্ছা, আমায় কোন একটা কাজ বল। আমি করব। কোন ভাল কাজ, যাতে দেশের মঙ্গল হয়।'

আমার মনে আছে, কখনও কখনও দেবের সঙ্গে দেশের অবস্থা নিয়ে কিছু কথাবার্ত্তা বলেছিলাম। মনে হচ্ছে, সে সব কথা তার মনের

মধ্যে কোথাও গেঁথে গেছে। কিন্তু আজ তার এ প্রশ্নে আমি যেন দ্বিধায় পড়লাম। কোথায় দেব আর কোথায় দেশের কাজ! যাই হোক বলতে তো কিছু হবেই তাই আমি বললাম: 'বেশী আর কি করবে—খাদি পর।'

'কিন্তু খাদি তো সহরে পাওয়া যায় আর সহর এখান থেকে বিশ-বাইশ মাইল দূরে'। কিন্তু এ কৈফিয়ৎ দিতে তার নিজেরই বোধহয় একটু কুণ্ঠা হ'ল। বলল: 'আচ্ছা আনিয়ে নেব কোন রকমে।'

দেব যেদিন থেকে খাদি ধরল, সেদিন থেকে গ্রামে যেন একটা তামাশার বিষয় হল। লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'হাজার ইঁদুর মেরে বেড়াল চললেন মক্কা'। কিন্তু দেবের সামনে ঠাট্টা করে এমন সাধ্য কার!

* * *

তিরিশের আন্দোলন শেষ হল। বত্রিশের ঝড় চলেছে। সাড়ে চার হাজার খ্যাপার সঙ্গে আমিও পাটনা ক্যাম্প জেলে বেশ আছি।

প্রত্যহ নতুন নতুন দল আসে, পুরাণো দল চলে যায়। এই যাওয়া-আসা এমন অপ্রতিহত ভাবে চলেছে যে এখন আর তাতে কোন হর্ষ বা বিষাদ অনুভূত হয় না। কত নদীর ধারা এসে মহাসাগরে মিশছে, কত জল বাষ্প হয়ে শূন্যে চলে যাচ্ছে—সে তার নিজের তরঙ্গের খেলায় উন্মত্ত—কমা-বাড়ার প্রশ্ন সেখানে কোথায়?

কিন্তু একদিন যখন এক পরিচিত মূর্ত্তিকে জেল-ফটকের ভেতরে আসতে দেখলাম, আর যখন বুঝলাম সে দেব, তখন আশ্চর্য্য ও আনন্দের আর সীমা-পরিসীমা রইল না। ইদানীং কিছুকাল দেবের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমি একজন লেখক, সম্পাদক, দেশভক্ত, নেতা—আমার আর সময় কোথায় দেবের খবর নেবার!

দেব জেলে আসবে এ তো অকল্পনীয়। আনন্দ হল খুব কিন্তু তখন কিছু জিজ্ঞাসা করবার অবসর পেলাম না। তাকে আমাদের ওয়াডেই রাখা হল। সন্ধ্যার সময় খাওয়া-দাওয়ার অব্যবহিত পরেই ওয়ার্ডে বন্দী হ'ল। ভেতরে আমরা দুজনে গ্রামের খবরাখবর নিতে নানা গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কাছাকাছি শুয়েছিলাম দুজনে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেব কাতরাচ্ছে, যেমন কোন এক মর্মান্তিক যন্ত্রণায় লোকে চেপে চেপে কাতরায়, আস্তে কিন্তু বড়ই কষ্টে, সেই রকম করে কাতরাচ্ছে দেব। কোন দুঃস্বপ্ন দেখছে নাকি? আমি তাকে ঝাঁকানি দিয়ে তুলে দিলাম। সে জেগে উঠল। কিন্তু আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। যখন ঘুমিয়ে পড়ল আবার কাতরানি আবার একবার তাকে জাগালাম—কিন্তু কতবারই বা জাগান যায়?

কুনকুন তার সঙ্গে এসেছিল, পরদিন সে এর রহস্য প্রকাশ করল। দেব আর সেই পুরাণো দেব নেই। দেব এবার নিজের থানার একচ্ছত্র নেতারূপেই জেলে এসেছে। নেতা? হাঁ, নেতা।

কিন্তু নেতা হবার কি মূল্য তাকে দিতে হয়েছে?

দেবের থানা কেবল জেলার মধ্যে নয় সমস্ত প্রদেশে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। কংগ্রেস বুলেটিনে তার প্রসঙ্গ থাকে। সত্যাগ্রহী দলগুলো অনবরত সরকারকে নাস্তানাবুদ করত আর সাবডিভিশনের ছোট সাব-জেলটাকে ভরিয়ে রাখত। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের মহা মুস্কিল। পুলিশের হানা, জেল, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত করা কিছুই কাজে এল না। যতক্ষণ না সব আপদের গোড়া দেব ধরা পড়ছে ততক্ষণ অন্যদের ধর-পাকড় বৃথা, দেবকে ধরবার সমস্ত চেষ্টাই বারবার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যে কাজ পুলিশ হাজার মাথা ঘামিয়ে আর দৌড়ঝাঁপ করেও কিছুই করতে পারেনি, একদিন দেব নিজেই তা করল। সে ভাবল

এবার একটু জেলের স্বাদ নেওয়া যাক। খবর প্রচার করে দেওয়া হল যে অমুক দিন থানায় শোভাযাত্রা আসছে আর তার নেতা থাকবে দেব। দারোগার নিজের শক্তির ওপর ভরসা হল না, কিছু সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ইনস্পেক্টার সায়েব তৈরি রইলেন—পাঁচ হাত লম্বা সেই ভীমকায় ইনস্পেক্টার! যথাসময়ে শোভাযাত্রা এল—এবং তার নেতা হিসাবে দেব বন্দী হল, তার সঙ্গে বন্দী হল কুনকুন এবং অন্য কয়েক জন। ছোট হাজতে তাদের একসঙ্গে পুরে দেওয়া হল।

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি হল। অর্দ্ধেক রাত। সমস্ত নিস্তব্ধ। কুঠরী খোলা হল, দেবকে ঘুম থেকে তুলে পাশের কামরায় নিয়ে যাওয়া হ'ল। তারপর?

তারপর বলতে বলতে কুনকুনের চেহারায় ক্রোধ ফুটে উঠল, চোখ দুটো রক্তবর্ণ হয়ে গেল। 'আর জিজ্ঞাসা কর না তারপর কি হল? উঃ ইনস্পেক্টার—উ…

'আমরা তার তর্জনগর্জন শুনতে পাচ্ছিলাম, অবিচ্ছিন্ন ভাবে মারের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, কারো পড়ে যাওয়া এবং আবার ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম—তবে কি দেবকে মারা হচ্ছে? কিন্তু চিৎকার তো নেই তার? তবে?

'আর এই চিৎকার না করাটাই তার পক্ষে কাল হ'ল। ইনস্পেক্টার তার চামড়া-মোড়া ব্যাটন দিয়ে, চড়, ঘুঁসি মেরে, পড়ে গেলে বুট শুদ্ধ লাথি মেরে যেতে লাগল। চিৎকার করা দূরে থাক দেবের চোখে এক বিন্দু জলও এল না "আজ হয় তোকে কাঁদাব আর না হয় প্রাণেই মেরে ফেলব" এই ছিল তার পণ। দেব নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তেজ ছাড়বে না।

'হাঁ প্রাণই দিচ্ছিল সে। মার খেতে খেতে সে অজ্ঞান হয়ে

পড়ল। জল খাইয়ে তার জ্ঞান ফেরান হল। "কাঁদবি না মরবি?" ইনস্পেক্টারের কথা শুনে দেব মুখ টিপে হাসল। হাঁ, দারোগা নিজে আমায় বলেছিল যে দেব মুখ টিপে হেসেছিল। তার পর আর কি— আবার লাঠি, ঘুঁসি, বুট, লাথি বর্ষণ হতে লাগল। দেব আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে যেই পড়ে গেল, সে বুটশুদ্ধ দেবের বুকে চড়ে জোরে জোরে ধামসাতে লাগল। দু-তিন বার ধামসানর পরই দেবের মুখে রক্ত—

'দারোগা চেঁচিয়ে উঠল—"হুজুর রক্ত, রক্ত"

'"মরুক শালা"—রাগে আত্মহারা হয়ে ইনস্পেক্টার বললে—"এটা আমাদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে।"

'কিন্তু বলা যত সহজ খুন করা তত সহজ নয়। সেও অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারল। এদিকে গোলমাল শুনে তখন আমরা হাজতের মধ্যে চেঁচামেচি করতে লাগলাম। শুনলাম সে আমাদের ওপর একচোট নেবে বলে শাসাচ্ছে। কিন্তু দারোগা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করল— "হুজুর এ কথা লোকে জানতে পারলে আমাদের একজনও এ রাত্রে আর বাঁচবে না; আপনি এ অঞ্চলের অবস্থা জানেন না।"

'ইনস্পেক্টার তখনই সেখান থেকে সরে পড়ল। তার কিছুক্ষণ পরে দারোগা দেবকে নিয়ে আমাদের কাছে এল।

'উঃ কি অবস্থা তার তখন। কিন্তু দেব একবার উঃ আঃ পর্য্যন্ত করল না। এ সম্বন্ধে কোন কথাও বলল না সে।

'সেই রাত্রেই মোটরে করে আমাদের সাবডিভিশন জেলে পাঠান হল। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে দেবের সারা শরীর ফুলে গেল। ওষুধপত্র দেওয়া হল—ওপর থেকে সে ভালও হয়ে গেল! কিন্তু যন্ত্রণা চেপে রাখবার মর্মান্তিক চেষ্টা করেছিল, সেটা যেন তাই তার মর্মস্থলে পৌঁছে

গেছে। সেই থেকেই রাত্রে ঘুমোবার সময় সে এই রকম কাতরাতে থাকে—'

শেষ হল কুনকুনের কথা। দিনের আলোয় আমি দেবকে ভাল করে দেখলাম। তার শরীর এখনও কালো দাগে ভর্ত্তি। কিন্তু তার সেই কালো-দাগ ভরা দেহের মধ্যে যে আত্মা আছে—তা চিরদিন জ্বলন্ত, দিব্য, জ্যোতির্ম্ময়।

বালগোবিন ভগত

জানি না কিসের প্রেরণায় আমার ব্রহ্মণ্যগর্বে উচ্চ শির সেই তেলীর সামনে নত হয়ে গিয়েছিল। যখনই দেখা হয়েছে আমি তাঁকে অভিবাদন না করে পারিনি। যদিও তখন ছিল আমার শৈশব, কিন্তু তা হলে কি হয়, তখন থেকেই আমাতে ব্রাহ্মণত্বের গৌরববোধ ষোলকলায় বিদ্যমান। সকালে-সন্ধ্যায় পূজো, আহ্নিক, গায়ত্রী জপ, ধূপধুনো জ্বালিয়ে, চন্দনতিলক কেটে আপ্রাণ চেষ্টা চলত পাকা ব্রাহ্মণ হবার—ব্রহ্ম জানাতি ইতি ব্রাহ্মণঃ। গ্রাম সম্পর্কে শৈশব থেকেই যে অব্রাহ্মণদের পালাগন[১] করতাম, ব্রাহ্মণত্বের উৎসাহে আমি তা পরিত্যাগ করলাম। ...কিন্তু তবু আমাদের সমাজের সবচেয়ে নীচু জাত সেই তেলী—তাঁর সামনে আমার মাথা আপনা হতে ঝুঁকে যেত। তেলী—যাদের

১ পালাগন—শাব্দিক অর্থ পদস্পর্শ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পদস্পর্শ করা হয় না, কেবল মুখে বলা হয়।

মুখ দেখলে অযাত্রা, 'তেলিয়া শ্মশান' এই ঘৃণাস্পদ বিশেষণ যাদের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে—সেই তেলী।

বালগোবিন ভগত তেলী। কিন্তু সে জাতের অন্য লোকদের মত কৃষ্ণবর্ণ তিনি নন। মাঝারি গঠনের ফরসা ধপধপে মানুষটি। বয়স ষাটের কিছু ওপরেই হবে। চুল পেকে গেছে। লম্বা দাড়ি বা জটাজুট নেই কিন্তু সাদা চুলে চেহারা যেন জ্বল জ্বল করত। পরিধেয় সামান্য, কোমরে কেবল একটি কৌপীন আর মাথায় কবীরপন্থীদের মত কাল ঢাকা টুপি। শীতের সময় একটা কালো কম্বল জড়িয়ে নিতেন। কপালে সর্বদা রামানন্দী সম্প্রদায়ের সাধুদের মত উজ্জ্বল চন্দনতিলক—নাকের অগ্রভাগ থেকে আরম্ভ হয়েছে—ঠিক স্ত্রীলোকদের সিঁদুরের টিকার মতই।[২] গলায় তাঁর টেরা বাঁকা তুলসীর মালা।

উপরের বর্ণনা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে বালগোবিন ভগত সাধু ছিলেন। মোটেই তা নয়, তিনি ছিলেন পূর্ণমাত্রায় গৃহস্থ। তাঁর গৃহিণীকে আমার স্মরণ নেই কিন্তু তাঁর পুত্র ও পুত্র-বধূকে আমি দেখেছি। কিছু ক্ষেতখামার ছিল এবং একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িও ছিল তাঁর।

কিন্তু জমিজমা দেখাশোনা এবং পরিবার থাকা সত্ত্বেও বালগোবিন ভগত সাধুই ছিলেন। সাধুর সকল পরিভাষাতেই তাকে সাধু বলা যেতে পারত। কবীরকে তিনি গুরু বলে মানতেন। কবীরের ভজন গাইতেন, কবীরের উপদেশাবলী পালন করতেন। কখনও মিথ্যা বলতেন না, মনে কোন ঘোরপ্যাঁচ ছিল না, কারো সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি

২ বিহারে গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা সিঁদুর তেলে গুলে নাকের অগ্রভাগ থেকে রেখা টানে।

কথা বলতে সঙ্কোচ ছিল না এবং অহেতুক কলহ কখনও করতেন না। পরের দ্রব্য স্পর্শ করতেন না কখনও এবং অনুমতি না নিয়ে কারো কিছু ব্যবহার পর্য্যন্ত করতেন না। তাঁর এই নীতিগুলি মাঝে মাঝে এত সূক্ষ্ম সীমায় পৌঁছে যেত যে লোকের মনে কৌতুকের উদয় হত। অপরের জমি তিনি শৌচকার্যে ব্যবহার করতেন না। ছিলেন গৃহস্থ, কিন্তু তাঁর সব কিছুই ছিল গুরুর। ক্ষেতে যা কিছু হত, প্রথমে তা মাথায় করে গুরুর দরবারে নিয়ে যেতেন—তাঁর বাড়ি থেকে চার ক্রোশ দূরে ছিল কবীরপন্থীদের মঠ। সেগুলো প্রথমে নিবেদনের পর প্রসাদ-রূপে যা ফিরত তাই তিনি বাড়ি নিয়ে আসতেন এবং তাই দিয়েই তাঁর সংসার চলত।

এ সবার ওপরে ছিল তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর। সর্বদাই তা শোনা যেত। কবীরের সেই সরল পদগুলি তাঁর মধুর কণ্ঠে সজীব হয়ে উঠত।

আষাঢের রিম্‌ঝিম্—সারা গ্রামের লোক ক্ষেতে জুটেছে। কোথাও লাঙ্গল দেওয়া হচ্ছে, কোথাও বা ধান রোপা হচ্ছে। জলভরা ধানের ক্ষেতগুলোতে ছেলেরা নাচানাচি করছে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের জন্য খাবার নিয়ে আলে বসে আছে। মেঘ-ছাওয়া আকাশ রোদের নাম-গন্ধ নেই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পূবে হাওয়া চলছে। এমনই সময় সুর তরঙ্গের ঝঙ্কার উঠছে। এ যে কি এবং গায়কই বা কে তা জিজ্ঞাসা করা বাহুল্য। বালগোবিন ভগতের সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত, তিনি নিজের জমিতে ধান রোপা করছেন। আঙ্গুল দিয়ে এক-একটি ধানের চারা সারে সারে ক্ষেতে বসিয়ে চলেছেন। তাঁর গানের প্রতিটি শব্দ সুরের সোপান দিয়ে ওপরে—যেন স্বর্গে পৌঁছে দিচ্ছেন আর তারই কিছু অংশ শ্রোতাদের কানে আসছে। শিশুরা শুনে খেলার মধ্যে উল্লাসে নেচে ওঠে, আলের ওপর দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোকদের ঠোঁট নড়ে ওঠে, গুণ গুণ করে ওঠে, হাল

মজুরদের পা'গুলো তারই তালে তালে পড়তে থাকে, রোপার কাজ করতে করতে লোকেদের আঙ্গুলগুলো যেন কোন বাঁধা তালে তালে চলতে থাকে। বালগোবিন ভগতের এ গান না যাদু!

ভাদ্রের অন্ধকার, মধ্য রাত্রি। অল্পক্ষণ আগে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। মেঘের গুড়গুড় শব্দে বিদ্যুতের গর্জনে হয়ত আপনি শুনতে পাননি, কিন্তু এবার ঝিঁঝি পোকা আর ব্যাঙের ডাক বালগোবিনের গানের সুরকে চাপা দিতে পারবে না। তাঁর খঞ্জনী ঝুন ঝুন করে বাজছে আর তিনি গাইছেন :

'গোদী মেঁ পিয়বা চমক উঠে সখিয়া, চিহুঁক উঠে না'—প্রিয়তমের অঙ্কে শায়িতা কিন্তু তবু সে ভাবছে যেন সে একাকিনী, সে চমকে উঠছে, শিহরিত হচ্ছে। সেই ভরা ভাদ্রের অর্দ্ধরাত্রির অন্ধকারে তাঁর এ গান শুনে কে না চমকে উঠবে? যখন সারা সংসার নিস্তব্ধ—নিদ্রামগ্ন, তখনও বালগোবিনের সঙ্গীত জেগে আছে। সে যেন জাগিয়ে বলছে—'তেরী গঠরী মেঁ লাগা চোর, মুসাফীর জাগ জরা'—পথিক জাগ, তোমার গাঁঠরী সামলাও, চোর এসেছে!

কার্ত্তিক মাস আরম্ভ হতেই বালগোবিনের প্রভাতী, ফাল্গুন পর্য্যন্ত চলবে সে প্রভাতী। এ সময় তিনি খুব ভোরে উঠতেন। কে জানে কখন ঘুম থেকে জেগে তিনি নদীতে স্নান করতে যেতেন। সেখান থেকে স্নানাদি করে ফিরে গ্রামের বাইরে পুকুরের পাড়ে উঁচু ঢিবিতে নিজের খঞ্জনী নিয়ে বসতেন আর আরম্ভ করতেন তাঁর প্রভাতী গান। আমি চিরদিনই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোই, কিন্তু মাঘ মাসের সেই হাড়-কাঁপান দারুণ শীতের ভোরবেলা একদিন তাঁর সেই গান যেন আমায় পুকুরের দিকে টেনে নিয়ে গেল। তখনও আকাশে তারার প্রদীপ নেভেনি। তবে পূর্ব্বাকাশ রাঙ্গা হয়ে গেছে—আর শুকতারা সেই রাঙ্গা রঙ্‌টাকে

আরো রাঙ্গা করে দিচ্ছে। ক্ষেতে, বাগানবাড়ি সমস্ত কুয়াশায় ছাওয়া। সারা বায়ুমণ্ডল যেন কি এক রহস্যে আবৃত বলে মনে হচ্ছে। সেই রহস্যময় পটভূমিতে পূর্ব্ব দিকে মুখ করে কালো কম্বল জড়িয়ে বালগোবিন ভগত নিজের খঞ্জনী নিয়ে বসেছেন একটা কুশাসনে, তাঁর কণ্ঠে স্বরলহরী আর হাতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে খঞ্জনী বেজে চলেছে। গাইতে গাইতে এমন ভাবে মেতে উঠেছেন, এমন এক জগতে পৌছে গেছেন মনে হচ্ছে এবার তিনি উঠে দাঁড়াবেন। কম্বলটা বার বার মাথা থেকে খসে যাচ্ছে নিচে। আমি শীতে কম্পমান, কিন্তু সেই আলো-আঁধারে তাঁর কপালের স্বেদবিন্দু চকচক করছে দেখতে পাচ্ছি।

গ্রীষ্মের দিনে তাঁর সান্ধ্য গীতগুলি কত উষ্ণ সন্ধ্যাকে শীতল করেছে। নিজের উঠোনে আসন করে বসতেন। গ্রামের ভক্তরা জুটত। খঞ্জনী আর করতালের শব্দ মুখরিত হয়ে উঠত। একটি পদ বালগোবিন গাইতেন, তাঁর ভক্তরা সেই পদটিকে দুবার তিনবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন। ক্রমশঃ স্বর উচ্চ হতে উচ্চগ্রামে উঠত—একটি নির্দ্দিষ্ট তালে, একটি নির্দ্দিষ্ট লয়ে। সুর ও তালের চড়াই-এর সঙ্গে শ্রোতার মনও উর্দ্ধলোকে উঠতে থাকত। ক্রমশ দেহ ও মন দুইই যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যেত। তারপরে এমন একটি ক্ষণ উপস্থিত হত যখন দেখা যেত মাঝখানে বালগোবিন ভগত খঞ্জনী বাজিয়ে নাচছেন আর তাঁর সঙ্গে সকলেরই দেহমন নৃত্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে। সমস্ত অঙ্গন সঙ্গীত ও নৃত্যে ওতপ্রোত হয়ে গেছে।

যেদিন বালগোবিন ভগতের পুত্রবিয়োগ হল তাঁর সঙ্গীতের চরম উৎকর্ষ দেখা গেল সেই দিন। একমাত্র সন্তান। কিছু অকর্ম্মণ্য ও নির্বোধের মত ছিল সে, কিন্তু সেই জন্যই বালগোবিন ভগত তাকে আরো স্নেহ করতেন। এমন লোকেদেরই বেশী যত্ন করা উচিত, এরাই অধিক

স্নেহের অধিকারী—এই ছিল তাঁর অভিমত। বড় সাধ করে তার বিয়ে দিয়েছিলেন, বৌটি ছিল শান্তশিষ্ট। ঘরের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে সংসারের অনেক ঝঞ্ঝাট থেকে সে ভগতকে মুক্তি দিয়েছিল। ছেলের অসুখ এ খবর রাখবার তাঁর অবসর কোথায়? কিন্তু মৃত্যু সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করে তবে ছাড়ে। শুনলাম, বালগোবিন ভগতের ছেলে মারা গেছে। তাঁর বাড়ি গেলাম। দেখে আমি অবাক। ছেলেকে উঠোনে একটা চ্যাটাইয়ের ওপর শুইয়ে সাদা কাপড়ে ঢেকে দিয়েছেন। কিছু ফুলগাছ তাঁর বাড়িতে থাকত, তাই থেকে কিছু ফুল আর তুলসীপাতা শবের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছেন। শিয়রে প্রদীপ জ্বলছে। আর তার সামনে মাটিতে বসে তিনি গেয়ে চলেছেন। তাঁর সেই পুরাণো কণ্ঠস্বর, তাঁর সেই চিরন্তন মগ্ন ভাব—ঘরে পুত্রবধূ কাঁদছে, গ্রামের স্ত্রীলোকেরা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বালগোবিন ভগত গেয়েই চলেছেন। মাঝে মাঝে গাইতে গাইতে ঘরে গিয়ে তাকে শোকের পরিবর্ত্তে উৎসব করতে বলছেন। আত্মা পরমাত্মার কাছে চলে গেছে, বিরহিণী নিজের দয়িতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এর চেয়ে মহান্ আনন্দ আর কি থাকতে পারে। আমার এক একবার মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যান নি তো! কিন্তু তা নয়, তিনি তাঁর অন্তরের বিশ্বাস থেকেই এ কথা বলছিলেন—এই সেই মৃত্যুঞ্জয়ী পরম বিশ্বাস।

পুত্রের শেষকৃত্যে কোন ত্রুটি হল না, পুত্রবধূর হাত দিয়ে তার মুখাগ্নি করলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধাদি শেষ হতেই পুত্রবধূর ভাইকে ডাকিয়ে তাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিলেন—আদেশ দিলেন তার পুনর্ব্বিবাহ দেবার। তাঁদের জাতিতে বিধবার পুনর্ব্বিবাহের রীতি নতুন নয়, কিন্তু পুত্রবধূর বড় আগ্রহ ছিল সে নিজের বৈধব্যের দিনগুলো ভগতজীর সেবায় কাটিয়ে

দেবে। কিন্তু সে এখন যুবতী, নিজের ইন্দ্রিয়কে বশে রাখবার বয়স তার হয় নি, এই ছিল ভগতজীর অভিমত। 'মন তো মত্ত হস্তী, যদি ভুলবশে উঁচুনীচু জমিতে পা ফেলে? না না—তুই যা!' এদিকে পুত্রবধূ কেঁদে বলছে 'আমি চলে গেলে বুড়ো বয়সে কে আপনাকে দুটী রেঁধে দেবে। রোগে পড়লে মুখে একটু জল কে দেবে। আপনার পায়ে পড়ি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন না।' কিন্তু ভগত একেবারে অটল 'তুই যা, না হলে আমিই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব'—এই তাঁর শেষ বক্তব্য। সে বেচারী আর কি করবে?

বালগোবিন ভগতের মৃত্যুও তাঁর যোগ্যই হয়েছিল। প্রতি বৎসর গঙ্গাস্নানে যেতেন তিনি। স্নানের জন্য যত না হোক সাধু দর্শন ও লোকের সমারোহ দেখবার জন্যই যেতেন তিনি। পদব্রজে যেতেন। গঙ্গা প্রায় ত্রিশ ক্রোশ পথ। সাধুর আবার সম্বলের কি প্রয়োজন? আর গৃহস্থের কাছেই বা ভিক্ষা চাইবেন কেন? সুতরাং ঘর থেকে আহার করে যাত্রা আরম্ভ করতেন, তারপর স্নান সমাধা করে ফিরে এসে পুনরায় আহার। সমস্ত পথ খঞ্জনী বাজিয়ে গাইতে গাইতে যেতেন, পিপাসা পেলে জল পান করতেন। যেতে আসতে চার-পাঁচ দিন লেগে যেত, কিন্তু সেই তূরীয় অবস্থা।

বুড়ো হয়েছিলেন, কিন্তু পণ সেই যৌবনের। শেষবার যখন স্নান থেকে ফিরলেন শরীরটা কিছু খারাপ হল। খাওয়া-দাওয়ার পরও সুস্থ হতে পারলেন না, সামান্য জ্বর হল। কিন্তু ব্রত আচার তো আর ছাড়তে পারেন না। সেই দু'বেলা সঙ্গীত, স্নান, পূজো এবং জমি দেখা-শোনা করা। ক্রমশ শরীর ভাঙতে লাগল। লোকে স্নানাদি করতে বারণ করল, বিশ্রাম নিতে উপদেশ দিল। কিন্তু তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায়ও গান গাইলেন, কিন্তু মনে হতে লাগল সূত্র কোথাও যেন ছিন্ন হয়ে গেছে, মালার এক-একটি দানা যেন ছড়িয়ে পড়েছে। ভোরবেলায় আর তাঁর গান শোনা গেল না। লোকেরা গিয়ে দেখল বালগোবিন ভগত আর নেই, কেবল তাঁর নশ্বর দেহখানি পড়ে আছে।

ভৌজী[1]

জীবনে সেই প্রথমবার আমি পালকিতে চড়েছি, দাদার বিয়ে আমি হয়েছি নিতবর। পালকিতে দাদা আর আমি। চারজন গাট্টা গোট্টা পালোয়ান কাহার আমাদের পালকি বইছে। পালকির মধ্যে চকচকে ঝালর ঝুলছে, চাঁদোয়ায় জরির কাজ করা। সামনে পেছনে নানা বাজনা বাদ্যি, ঢোল শানাই, বাঁশী, তাশ, শিঙ্গে···। সব মিলে এক বিচিত্র ধ্বনি। পাশে পাশে চলেছে বল্লম আর পতাকা হাতে পাইক। আমাদের বোদল ঠাকুর[2] আমাদের ওপর চামর দোলাচ্ছে। ঘোড়াগুলো সওয়ারী নিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। হাতির ঘণ্টা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম।

দাদার সাজসজ্জা হয়ে গিয়েছিল। রঙিন ঝক্‌মকে জামা কাপড়, মাথায় জরির টুপি। কপালে চন্দনের অদ্ভুত ছাপ, চোখে কাজল, সবেমাত্র ওঠা গোঁফের রেখার ওপর রুমাল চাপা দিয়ে আছে। না

১ ভৌজী—বৌদি।

২ ঠাকুর—বিহারে নাপিতকে ঠাকুর বলা হয়।

জানি দাদার মনে কত রকম ভাবেরই উদয় হয়েছিল কিন্তু আমি তো নিজের আনন্দে মসগুল। নিজের জীবনে বরযাত্রী হওয়া, বাজনা বাদ্যি এ সবই প্রথম আমার কাছে। তবে কখনও কখনও ভাবছিলাম দাদার চেয়ে আগে আমিই বৌদিকে দেখব।

সন্ধ্যার সময় বরের শোভাযাত্রা বিয়েবাড়ীর দরজায় পৌছল। বরযাত্রীর দল ভাল ছিল, আদর আপ্যায়নও ভালই হল। নতুন করে চুনকাম করা খাপরার চালের বাড়ী, দাদার শ্বশুরবাড়ী কোলাহলে ভেঙ্গে পড়বার জো। ভেতরে মেয়েদের দল দাদাকে বরণ করছিল। দাদার হাতে পান, সুপারী, টাকা আর দইয়ের একটা ছোট ভাঁড় রাখা হল। তার এ হেন আদর আপ্যায়নে আমার মনে একটু হিংসা হচ্ছিল বৈকি। এমন সময় এক যুবতী আমার গালে দই লাগিয়ে হা হা করে হেসে উঠল। মহিলারা—অর্থাৎ যুবতীরা খুব জোরে জোরে হাসতে লাগল।

এই হাসির মধ্যে একটা অট্টহাসি আমার কানে বেসুরো বেজে উঠল। বাইরে বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীদের মধ্যে হাসি মস্করা চলছিল। দু পক্ষই কথাবার্তার চেয়ে অট্টহাসির জোরে বিরুদ্ধ পক্ষকে পরাস্ত করবার চেষ্টা করছিল। অনেকক্ষণ ধরে হাসি চলল কিন্তু শেষে হাসি ঠাট্টার মধ্যেই রাগারাগি হয়ে গেল যেন মাখনে বালি মিশেছে। বরযাত্রীর দলে আমাদের পিশেমশাইও ছিলেন। তিনি ছিলেন বেশ গৌরবর্ণ সুপুরুষ যুবক। তাঁর বাড়ী চম্পারণ। সে সময় ওদিকে পুরুষের বড় চুল রাখার রেওয়াজ ছিল। সৌখিন যুবকেরা মাথায় কোঁকড়ান লম্বা চুল রাখত—সুন্দর করে দু ভাগে ভাগ করা আঁচড়ান। দাদার শ্বশুরবাড়ীর গ্রাম সংস্কৃতির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল সন্দেহ নেই। পিশেমশাইএর চুল নিয়ে কে যেন স্থূল রসিকতা করে

ফেলল। তিনি ভদ্রলোক ছিলেন চুপ করে গেলেন কিন্তু আমাদের দলের লোকেরা তাঁর অপমানকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরম আদরণীয় অতিথির অনাদর বলে মনে করল। কথায় কথায় কথা বেড়েই গেল। এমন সময় কে যেন রাগ করে বলল, 'বর উঠিয়ে নিয়ে চল'। ব্যস আর যায় কোথা, ভয়ানক হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

এক দিকে 'চল চল' আর এক দিকে 'ঘিরে ফেল, ঘিরে ফেল' রব উঠল। ঘোড়সওয়ারেরা তো ঘোড়া দৌড় কাটিয়ে আগে বার হয়ে গেল। লাঠিয়ালেরা হাতি ঘিরে ফেলল। কে বরযাত্রী আর কে কন্যাযাত্রী তা চেনা কঠিন হয়ে পড়ল। আমাদের পালকি অদ্ভুত ভাবে এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল—এক পক্ষ যদি সেটা দশ গজ এগিয়ে নিয়ে যায় অন্য পক্ষ সেটা আবার দশ গজ পিছিয়ে আনে। কাহাররা হকচকিয়ে গেছে, পালকির মধ্যে বসেই লাঠির খটাখট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অদ্ভুত শোভাযাত্রা বটে। জীবনে বরযাত্রী হওয়ার এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

যাক কিছুক্ষণের মধ্যে শান্তি হল। আমাদের ঠাকুর্দা মশাই বড় শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় সব ঠিক হল। বরপক্ষের সকলে আবার তাদের থাকবার জন্যে যে বাসা ঠিক হয়েছিল তাতে এসে একত্রিত হল। সকলে শান্ত হওয়ার পর ঠাকুর্দাকে বলতে শুনলাম 'খারাপ ঘরে নাতির বিয়ে দিলাম। ছেলেপুলেগুলোকে ভগবান রক্ষা করুন, এদের মতন যেন না হয়।'

*　　　*　　　*

ভারতীয় পরিবারে বৌদির স্থান ঠিক মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যানের মত। ধক্‌ধকে বালুরাশির ওপর গরম ঝড়ের মধ্যে দিয়ে কত দিন কত রাত্রি চলতে চলতে যখন যাত্রীদের চোখে পড়ে খেজুর গাছের সবুজ পাতা—

তখন কেবল তাদের চোখই নয় তাদের শরীরের প্রতি রোমকূপ পুলকিত হয়ে ওঠে, শিরার প্রতি রক্তবিন্দুটি আনন্দে নৃত্যপরায়ণ হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের জন্য তাদের সারা জীবন যেন সবুজ সরস হয়ে ওঠে। খেজুরের কুঞ্জে তারা পায় মিষ্টি ফল, শীতল জল। একদিন সেখানে আনন্দে অতিবাহিত করে রক্ত সঞ্চয় করে নেয়। তারপর আবার তাজা হয়ে নতুন উদ্যমে যাত্রা আরম্ভ করে—আবার সেই অনন্ত বালুরাশি।

ভারতীয় সমাজে যে রুক্ষতা শুষ্কতা সর্বত্র বিদ্যমান তার কারণ খুঁজে সময় নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর এই রুক্ষতারই আধিপত্য দেখতে পাবে। বিরস মুখ, অপ্রসন্ন দৃষ্টি, রোগা পটকা দেহ, মূর্ছিত মরণাপন্ন মন—ভারতবাসীর এই হল স্বাভাবিক ছাঁচ। খুব কম কথা বলা, হাসি নেই কদাচিৎ কেবল একটু মুচকি হাসি, সর্বদা নিজের চারিদিকে বিষাদের আবহাওয়া—এইগুলিই হল সজ্জনতা ও শিষ্টতার প্রশংসনীয় পরিচয়। খেলাধুলো, গানবাজনা, নাট্য প্রহসন ইত্যাদিতে মন দিয়েছ কি লোকের দৃষ্টিতে আর তুমি সজ্জন নও। অবশ্য আমরা দোল খেলি, বিজয়া পালন করি, দেওয়ালীতে সাজসজ্জা করি কিন্তু এগুলি আমাদের জীবনযাত্রায় ক্ষণিকের চমক, ব্যতিক্রম। আমাদের জীবনের স্থায়ী বাতাবরণ—বিষাদের, মৃত্যুর।

কোন পরিবারের উদাহরণই নেওয়া যাক। পতি নিজের পত্নীর কাছ হতে সরে দূরে থাকতে চেষ্টা করে, পত্নীর লজ্জা সঙ্কোচের তো কথাই নেই। চুপিচাপি চুরি করে দেখা, ফিসফাস করে কথা, হাসি যেন ঘোমটার বা রুমালের ফাঁক দিয়ে বাইরে না শোনা যায়। বাপ-মায়ের কাছেও ছেলেমেয়ের হাসা আবদার করা নিষেধ। কারও বাড়ীতে যদি বৃদ্ধ ঠাকুর্দা বেঁচে থাকেন তাহলে তো সকলের মুখেই তালাচাবি বন্ধ। ভাইয়ের সামনে বা'র হতে যুবতী ভগ্নীর সঙ্কোচ,

ভাইয়ের দশাও তথৈবচ। বড় ভাইয়ের পক্ষে তার ছোট ভাইয়ের বৌ-এর ছায়া মাড়ানও নিষিদ্ধ। বধূরা শাশুড়ীকে দেখলেই সঙ্কুচিত, বড় জা যেন দু নম্বরের শাশুড়ী। যে মেয়ে হাসে খেলে, দুষ্টুমী করে বা জোরে হাঁটে তার তো কপালে শত দুঃখ—'তিরিয়া চঞ্চল অতি বুরি'—চঞ্চল স্ত্রী অতিশয় মন্দ—বলেন নি কি গিরিধর দাস!

এ হেন নিরানন্দ নিস্পন্দ জীবনে বৌদির অস্তিত্ব সত্যই যেন মরুভূমির মধ্যে মরূদ্যান। আর যাই হোক না কেন সব বাড়ীতেই যদি বৌদি থাকে তাহলে সর্বদাই হাসি ঠাট্টা চলে, রঙের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কিশোর-কিশোরী-দেবর-ননদদের মজলিস, হাহা, হিহি, কাড়াকাড়ি, ফেলা ছোড়া চলতেই থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও এ আনন্দরস হতে বঞ্চিত হয় না।

বৌদি আসাতে আমাদের বাড়ীতেও আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। বৌদি তখনও কিশোরী, তার ঠোঁট দুটি তখনও রসঘন হয় নি, অঙ্গ পরিপূর্ণ হয় নি। দীর্ঘ দেহ। ক্ষীণ যষ্টির মত তখন সে। সোনার বর্ণ নয়। একথা বলতে আমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই যে তার গায়ের রঙে দ্রাবিড় ও আর্যরক্তের সুন্দর সংমিশ্রণ হয়েছিল। কেবল বর্ণ নয়, দেহের গঠনও। উন্নত ললাট, পুষ্ট অথচ সূক্ষ্ম ভ্রূ। কালো কালো ঢেউ খেলান চুল। খুলে দিলে যেন আবর্ত ভরা যমুনার ধারা। নাকটি গোড়ার দিকে অল্প চাপা, কিন্তু অগ্রভাগ খুব সুন্দর। ঠোঁট দুখানা একটু পুরু, কিন্তু চিবুকের মিষ্টি গড়ন তার এই খুঁতটুকু চাপা দিয়ে দিয়েছে। আর তার সার-গাঁথা সাদা ধপধপে দাঁতগুলো—হাসলে যেন মুক্তো ঝরে পড়ত। ছেলেবেলায় আমার তো তাই মনে হ'ত।

অল্প দিনের মধ্যেই বৌদি সকলকে স্নেহের বন্ধনে বেঁধে ফেলল। বাড়ীর বড়দেরও প্রশংসার পাত্রী হল সে। তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করত,

তাঁদের আদেশ প্রাণপণে পালন করত। বৌদি অন্য কাজকর্মেও নিপুণ ছিল। সে সেলাই ফোঁড়াই ভাল জানত, এম্ব্রয়ডারী করতে জানত। যখন রান্নার ভার তার ওপর পড়ল তার প্রশংসা সকলের মুখে। কেবল যে রান্না ভাল তাই নয় পরিবেশনের ঢঙটিও তার ভারি সুন্দর ছিল। পরিবেশন করাও যে একটি শিল্প তা যেন সে প্রমাণ করে দিল। বৌদির সুখ্যাতিতে দাদার মা অর্থাৎ আমার খুড়িমা খুশিতে ডগমগ হয়ে যেতেন। এমন সুন্দর গুণবতী পুত্রবধূ পেয়ে কোন শাশুড়ীর গর্ব না হবে।

বৌদির ঘরখানা আমাদের অর্থাৎ তার দেবরবৃন্দের প্রধান খেলাঘর ছিল। পাঠশালার ছুটি হলেই আমরা দৌড়ে বৌদির ঘরে যেতাম। বৌদি হেসে আমাদের ডেকে নিত, জলখাবার দিত, সুপারী লবঙ্গ দিত—তাতে আবার মেশান থাকত মনাক্কা। বৌদির সঙ্গে গল্প হত, খেলা হত। হাসি ঠাট্টা হত, হাসতে হাসতে দু একটা গালি দেওয়া, চড়-চাপড়ও হয়ে যেত। বৌদি তখনও কিশোরী ছিল, আমাদের সঙ্গে সে পেরে উঠত না।

উৎসাহ বেশী হলে কখনও কখনও লুকোচুরি খেলা হ'ত তার সেই ঘরখানায়। গৃহস্থ বাড়ির ঘর, বেশ লম্বা চওড়া। আনাচে কানাচে শস্য রাখবার মাটির জালা ছিল। এক কোণে ছিল কাঠের একটা বড় সিন্দুক, আমরা সেই জালার আড়ালেই লুকোতাম। একদিন আমার মাথায় এক নতুন ফন্দী এল। একটা জালার ওপর চড়ে ঘরের 'ধরণে'র[৩] মোটা কাঠখানার ওপর চড়ে লুকিয়ে রইলাম। বৌদি সারা

৩ ধরণ—একটা খুব মোটা কড়িকাঠের মত, খাপরার চাল 'ধরণের' ওপরই থাকে। অবশ্য ধরণের সঙ্গে চাল ছাওয়া হয় না, ধরণের ওপর অন্য কাঠ উঁচু করে দাঁড় করিয়ে চালের কাঠামো তৈরি হয়।

ঘর খুঁজে নাকাল হল। জালাগুলোর পেছনে, সিন্দুকটার পেছনে তলায় আমায় খুঁজে না পেয়ে সে যখন জালাগুলোর মধ্যে ঝুঁকে দেখতে লাগল তখন আমি ধরণের ওপর থেকে খুব জোরে হেসে উঠলাম। সে চমকে উঠল—ততক্ষণে আমি ওপর থেকে নেবে পড়ে তার গলা ধরে ঝুলছি। সে আমায় নিয়েই খাটের ওপর পড়ল, হাসতে হাসতে দুজনের পেটে খিল ধরে গেল।

সে বছর বৌদি আসার প্রথম দোল। কি যে আনন্দ করলাম তা বলবার নয়। বসন্ত পঞ্চমীর দিন থেকে দোলের ন্যাড়া পোড়ার দিন পর্যন্ত একমাস দশদিন ধরে আমরা রঙ খেলেছিলাম। কোথাও থেকে বাড়ীতে ফিরলে বৌদি গালে রঙ মাখিয়ে দিল নয় আমরাই তার গালে আবীর ঘসে দিলাম। আসল রঙ খেলার দিন প্রথমে তাকে কাদা জলে ভিজিয়ে দুপুরে আবার রঙে রঙে চুবিয়ে দিলাম। গ্রাম সম্পর্কের সমস্ত দেবর ও ননদেরা এসেছিল যথেচ্ছ রঙ খেলবার জন্যে। সকলের খাতির যত্ন করল বৌদি, সকলের মুখে তার সুখ্যাতি। একথা কারও মনেও পড়ল না যে বৌদি এসেছে সেই গ্রাম থেকে—যেখান থেকে ফিরে সব বরযাত্রী নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিল।

* * *

তারপর দশ বৎসর পরের কাহিনী।

আমি সহরে পড়াশোনা করি, মাঝে মাঝে বাড়ী আসি। বাড়ীও সে পুরোন বাড়ী আর নেই—এখন তার সাজান বাগান শুকিয়ে গেছে, সব বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাড়ীতে একাধিক হাঁড়ি চড়ছে। সকলে ভিন্ন হয়েছেন, কাকা আর দাদাও ভিন্ন হয়েছেন সুতরাং বৌদিও ভিন্ন হয়েছে। তার শাশুড়ী অর্থাৎ আমার খুড়িমা মারা গেছেন, এখন বৌদিই ঘরের গৃহিণী। তার কোলে এক ছেলে—আমার প্রিয় ভাইপো।

কেবল হাঁড়ি উনুন নয় হৃদয়ও ভিন্ন হয়ে গেছে। সে স্নেহ ভালবাসাও নেই, সে মিষ্টি আন্তরিকতাও নেই। সমস্ত পরিবারে ঝগড়া-ঝাঁটি। পুরুষেরা তো সারা দিন কাজকর্মে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত খামারে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মেয়েদের তা নয়। একই উঠোনে তাদের আনা-গোনা, দু চারটে বাঁধা কাজ যেমন রান্নাবাড়া ইত্যাদি করে আর বাকি সময়টা হুঁকো টানে আর ঝগড়া করে। রান্নার সময়ও তো মুখ বন্ধ করবার প্রয়োজনই হয় না—কেবল ঝগড়া আর ঝগড়া। সারা বাড়ী যেন নরক। পরিবারের বয়োবৃদ্ধরা যথা ঠাকুর্দা, বড় জ্যাঠামশাই খেতে এলে কিছুক্ষণের জন্য যুদ্ধবিরতি না হলে—অবিরাম কলহ চলত যতক্ষণ না নিদ্রার ব্যবধান আসে।

আর এ কলহে বৌদির কথা আর বলে কাজ নেই। বংশ ও জন্ম-স্থানের আবহাওয়ার কি প্রভাবই না পড়ে মানুষের প্রকৃতিতে এ তারই নিদর্শন। দশ বৎসর পর্যন্ত যে বস্তু বারুদের নিচে চাপা ছিল তাতে যেন হঠাৎ বিস্ফোটন হল। যে মুখে কেবল ফুল ঝরত তা হতে এখন কেবল বিষমাখান চোখা চোখা তীর নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বৌদির গালি-গুলো যেন হৃদয় ভেদ করে ফেলে। স্ত্রীলোকের সম্মান করা উচিত, ভ্রাতৃবধূ মাতৃতুল্য এ সব আধুনিক জ্ঞানই আমার হয়েছে। কিন্তু আমি একদিন আর সহ্য করতে পারলাম না। আমি পরিবারের কলহ হতে দূরে থাকতে চেষ্টা করতাম, বৌদির ছেলেকে সারাদিন কাঁধে নিয়ে বেড়াতাম। বৌদির তীরের লক্ষ্যস্থল যে আমাকেও হতে হবে এ আমি কখনও কল্পনাও করিনি। কিন্তু এ কি! সেদিন আমি খেতে এসেছি, দেখি উঠোনে খুব চেঁচামেচি। আমি বৌদিকে ধীরে ধীরে বললাম : 'দয়া করে একটুখানি ক্ষমা দাও—তারপর নরক তো আছেই·· ···'

আর যায় কোথা, শুরু হল গালি। আমার বক্ষস্থল লক্ষ্য করে

এমন এক একটি তীর বর্ষিত হতে লাগল যে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। ক্রোধে পাগল হয়ে আমি যে কি করে ফেলছিলাম তা বুঝলাম যখন দেখি দাদা আমায় ধরে আছে আর বৌদি ঘরের দরজা বন্ধ করে খুব চিৎকার করছে।

বৌদির গায়ে আমি হাত তুলিনি এবং দাদা আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল না। ব্যাপারটা ছিল এই যে আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে বৌদি প্রথমে কিছু কটূক্তি করল যাতে আমি থেমে যাই; তারপর সে দৌড়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের দরজা বন্ধ করে চিৎকার করতে লাগল—বুঝি বা আমি তাকে মেরেই ফেললাম! গোলমাল শুনে দাদা দৌড়ে এসে আমায় উঠোন থেকে টেনে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। নিজের ক্রোধের জন্য সত্যই আমি লজ্জিত হয়েছিলাম, বৌদি যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে নিজেকে না বাঁচাত আর দাদা না এসে পড়লে আমি হয়ত এক অক্ষম্য অপরাধ করে ফেলতাম, তার ফল বাড়ীতে যে কি হ'ত কে জানে।

কিন্তু এই ঘটনার পর হতে আমার একটা শিক্ষা হল। পরিবারের দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সাবেক বাড়ী হতে দূরে থাকবার জন্য বাড়ী তৈরি করিয়ে সেখানে উঠে গেলাম। কিন্তু কদিনেই বুঝলাম বৌদি সাধারণ মেয়ে নয়। প্রায়ই এসে সে নিজের মনের ঝাল মিটিয়ে যেত। মাঝে মাঝে মনে হত অবশেষে কি গ্রাম ছেড়েই চলে যেতে হবে নাকি? হয়ত হ'তও···কিন্তু······। সেই কথাই লেখবার জন্য এ কাহিনী লিখছি—স্বর্গগতা বৌদির নিন্দা করবার জন্য নয়। তাঁর নিন্দা করা অপেক্ষা লেখনী ভেঙ্গে ফেলাই শ্রেয়ঃ।

যে লেখনী কেবল পরনিন্দার্থে ব্যবহৃত হয় তা ভেঙ্গে যাওয়াই তো ভাল।

আমার এক সম্পাদক মিত্র আছেন। তিনি ভয়ানক রকম

জাতীয়তাবাদী এবং আমি সমাজবাদী। সুতরাং এমন প্রায়ই হয়ে থাকে যখন আমার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে তিনি নিজের পত্রিকার কলমে আমার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর সমালোচনা আমার হৃদয়ে অবশ্যই মধুবর্ষণ করে না।

কিন্তু যখনই সরকারী তরফ থেকে আমায় দমন করা হয় অথবা কোন গোঁড়া সংবাদপত্রে আমার বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়, তাঁর সমালোচনার 'ফোকাস্' তৎক্ষণাৎ ঐ দিকে ঘুরে যায়। অর্থাৎ 'এ আমার, আমার ইচ্ছা হয় একে গালি দেবো, ইচ্ছা হয় স্তুতি করব, তুমি বলবার কে।' তা ছাড়া আমার ব্যক্তিগত সুখদুঃখে এমন করে আমায় তাঁর নিজের করে নেন যে তিনি যে আমার এত কঠোর সমালোচক তা কল্পনাও করা যায় না।

বৌদিরও ঠিক এই অবস্থা।

বৌদি গালি দিত, কলহ করত, আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলত। কিন্তু যদি অপর কোন মহিলা আমার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যেত তাহলে আর তার রক্ষা ছিল না।

'তোকে কে ডেকেছে আমাদের কথায় কথা বলতে? ও মন্দ আর তুই? দূর হ' সামনে থেকে! "সূপ হাসে ছলনী কো জিসমে সহস্‌মর ছেদ" অর্থাৎ চালুনী বলে ছুঁচ তোর······ছেঁদা! আমি তোকে চিনিনে? ডাইনী কোথাকার! আমার ওপর তোর ডানপনা খাটবে না, তোর চোখ উপড়ে নেব, জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব! রোজা ডেকে ন্যাংটো নাচাব তোকে—আমার বাপের বাড়ীতে আছে রোজা, তাকে দেখলেই ডাইনীরা পরনের কাপড় খুলে ফেলে! ও মন্দ, তোর কি? আমি ওর সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব—তোর আর আটায় কাজ নেই, দূর হয়ে যা······'—ইত্যাদি।

ওঃ সে কি বাক্যবাণ—! অপর স্ত্রীলোক চুপ। যদি কিছু বলেছে আর রক্ষা নেই—আমার সঙ্গের ঝগড়া পড়ল তার সঙ্গে, আর এ জিহ্বা-সংগ্রামে বৌদির সমকক্ষ আছে গ্রামে?

ব্রত উৎসবের সময় হত সন্ধিপূর্ণ যুদ্ধবিরতি। এমনিতেই তার দেহ ছিল এমন সুগঠন আঁটসাঁট যে চল্লিশ বছরেও মুখে জৌলুস, সাদা চকচকে দাঁত, উন্নত বক্ষ, চলনে লালিত্য। ব্রত উৎসব ইত্যাদিতে সে সাজসজ্জা করত, দোলের সময় প্রবল উৎসাহ। প্রৌঢ় চিন্তাজর্জর দেবরদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসত, হাতাহাতি হত, কাদা মাখান এবং স্নানাদির পর আবীর অভ্র মাখানয় ছিল পরম আনন্দ। এমন একটি দোলও মনে পড়ে না যেদিন বৌদি কাদাজল, আবীর অভ্র না মাখিয়েছে, পান মিষ্টি মালপুয়া না খাইয়েছে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে বৌদির, আমি একবার বললাম: 'বৌদি এবার ছেলেমেয়েদের দোল খেলতে দাও—আমরা দেখি।'

বৌদি বলল: 'বা রে! বুড়ো হয়েছি বলে কি মনও বুড়িয়ে গেছে নাকি? ছেলেমেয়েরা নিজেরা দোল খেলুক, আমরাও নিজেরা খেলব—তাদের নিজেদের মন, আমাদেরও নিজেদের মন'—বলে সে কি প্রাণ-খোলা হাসি।

ছেলেদের ও এত স্নেহ করত।

ঝগড়ার মধ্যেও আমার বাড়ী এসে আমার ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে দিত, তেল মাখাত, কাজল পরাত। তাদের খেলা দিত, কোলে নিত। একবার দেখি আমার ছেলেকে কোলে নিয়ে ছেলের মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করছে। আর যেই ছেলে কেঁদে উঠছে তার মুখে চট করে নিজের স্তন দিচ্ছে।

একদিন এই রকম কলহ হচ্ছে রাণীর সঙ্গে, এমন সময় আমার বড়

ছেলের কান্নার শব্দ শোনা গেল। ঝগড়া স্থগিত রেখে সে দৌড়ল 'আমার বাছাকে কে মেরেছে' বলতে বলতে। বাঙের মত আমার ছেলেকে তুলে নিয়ে এল—ছেলে কাঁদছে তাকে বোলতা কামড়েছে। ছেলেকে রাণীর কোলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে কেরাসিন তেল আর গেঁদা ফুলের পাতা এনে হুল ফোটান জায়গাটায় লাগিয়ে দিল। এই ছিল গ্রামের টোটকা। বাচ্চা কাঁপছিল, বেশ জোরাল হুল, তার জ্বরও হয়ে ছিল।

যতক্ষণ তার জ্বর রইল আমার বাড়ীতেই বৌদির কাটল সারা বেলা, সে বেলা তার রান্না হল না। দাদা হাসতে হাসতে বলল আমার স্ত্রী রাণীকে : 'এমন ঝগড়া বটে যে আমার খাওয়াই জুটল না।'

সেদিন আমার বাড়ীতে তার খাওয়া হল।

তাই আজ যখন বৌদি নেই আমার স্ত্রী রাণী তার দুটি সন্তানের 'ধর্ম মা'। তাদের বিয়ের সময় কিছু আর বাদ রাখেনি সে। বৌদি যখন ছিল, কলহ হ'ত, তার স্মৃতি সেই কলহকে স্নেহে পরিণত করে দিয়েছে।

আমি যখনই আমার সেই সম্পাদক বন্ধুর কাছে যাই, ইচ্ছা হয় তার চরণ স্পর্শ করি, বয়সেও বড় তিনি। আর যখনই বৌদিকে মনে পড়ে দু হাত জোড় করে বলি 'তোমায় প্রণাম করি।'

পরমেসর

সেদিন নিজের অফিসে কাগজের স্তূপের মধ্যে কাজে বসেছি, এমন সময় গ্রাম থেকে শ্রীরাম এল। গ্রামের খবরাখবর দিতে দিতে বলল : 'পরমেসরের খুব অসুখ, বাঁচে কি না বাঁচে।'

পরমেসর আমাদের জ্ঞাতি কিন্তু তার সঙ্গে এমন কোন নিকট সম্বন্ধ নেই বা তার মধ্যেও এমন কোন কিছুই নেই যাতে তাকে দেখবার জন্য কাজকর্ম ছেড়ে দৌড়োদৌড়ি করে বেণীপুরে যাবার কল্পনাও মনে আসতে পারে। পরমেসর একটা বাউণ্ডুলে, উড়নচড়ে। নিজের সংসার সে নষ্ট করেছে। ধারের ওপর ধার, পৈতৃক জমি বিক্রি করে, সর্বস্ব ভুষ্টিনাশ করে অবশেষে সে-বছর নিজের স্ত্রীর গহনাগুলো পর্যন্ত বিক্রি করে গাঁজা খেয়ে ফুঁকে দিল। সে আমাদের বংশে কালি দিয়েছে, আপনজনদের বিপদ আর কষ্টের কারণ হয়েছে। নিজেরও এখন দুর্গতির একশেষ।

হতভাগা মরুক, এমন লোকের মরাই উচিত—। আমি এইপ্রকার যুক্তি সহযোগে নিজের বিবেককে স্তোক দিয়ে কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই কাজের ভিড় যেমন কমে গেল, একটু নিশ্চিন্ত হলাম, অমনি পরমেসরের কথা মনে হল। রাত্রের ষ্টিমারেই গ্রাম রওনা হলাম।

এই পরমেসরের বাড়ি। সাবেক কালের চারদিক ঘেরা বাড়ির জায়গায় এখন এই কুঁড়ে ঘরখানা। এই একটিই তার রান্নাঘর, ভাঁড়ার এবং শয়নঘর। সেই ঘরেই তার মা এবং স্ত্রী, ভাই ও ছেলেপুলেরা থাকে। বৃদ্ধ পিতাও তারই বারাণ্ডার এক কোণে, এবং আর এক কোণে পরমেসর নিজে খড়ের ওপর পড়ে আছে। একটা ময়লা চিরকুট চাদর দিয়ে রুগীকে হাওয়া-বাতাস থেকে বাঁচান হয়েছে। তার রোগও ভয়ানক—অতিসার। একশ চার ডিগ্রি জ্বর এবং অনবরত দাস্ত। সমস্ত জায়গাটা গন্ধে ও নোংরায় ভর্ত্তি। তবুও মা বেচারী তার সেবায় লেগে আছে, বুড়ো বাপ 'হায় হায়' করছে আর তার স্ত্রী একটি কোণে গুটিয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

অতিসার হল কেন? ইদানীং খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট যাচ্ছিল। ক'বেলা খাওয়া নেই। কে একজন ক্ষেতে রাঙ্গা আলু খুঁড়ছিল, তার কাছে হাসতে হাসতে গিয়ে হেসে হেসে কাঁচা রাঙ্গা আলু খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেলল। হজম হল না, পেট ছেড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। সে অর্দ্ধচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, এক-একবার বহু কষ্টে চোখ খুলছে। চক্ষু কোটরগত—একেবারে যেন গহ্বরে ধ্বসে গেছে।

ভৎর্সনার সময় এ নয়। কাছের আয়ুর্ব্বেদীয় হাসপাতালের কবিরাজকে ডাকা হল, তিনি দেখলেন, ওষুধ দিলেন। কিন্তু আমায় জনান্তিকে বলে গেলেন—লক্ষণ সুবিধার নয়, রাতটা কাটলে হয়ত একটু আশা আছে। সে রাত আর কাটল না। বাড়ির সকলকে কাঁদিয়ে গ্রামের লোকেদের শোকাচ্ছন্ন করে পরমেসর ইহলোক পরিত্যাগ করল।

* * *

গ্রামবাসীদের শোক শুধু এক দিনের নয়, যখনই দোল, দুর্গাপূজো, দেওয়ালী, ছট[১] বা কার্ত্তিক পূর্ণিমা এসেছে, পরমেসরের অভাবে নতুন করে তাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়েছে।

নিঃসন্দেহে পরমেসর ছিল বাউণ্ডুলে, কিন্তু তার সেই বাউণ্ডুলে-পণার মধ্যে এমন আগুন ছিল যে সে আগুন তাকেই জ্বালিয়ে দিল—কিন্তু অপরদের দিয়েছে আলো আর উত্তাপ।

ছোটবেলায় আমাদের সঙ্গে পড়তে গেল, বেশ বুদ্ধি ছিল কিন্তু পড়া-শোনা করল না। বড় হল যখন বেশ ফরসা ছিপছিপে নব যুবক। বেশ ভাল ঘরেই বিয়ে হল তার। কালক্রমে ছেলেপুলেও হল। তার বাবা ছিলেন একেবারে সাদা-সিধে সরল মানুষ, কাজে কাজেই বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়ির কর্ত্তা হয়ে বসল। বাড়ির ওপর কর্ত্তৃত্বের

১ ছট—কার্ত্তিক ষষ্ঠীর একটি বিশেষ পর্ব্ব।

রাশ টেনে ধরার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপর কর্তৃত্বের রাশ আল্‌গা করে ফেলল। রোজ হাটে যেত, যথেচ্ছ সহরে যেতে লাগল, প্রত্যেক মেলায় যাওয়া চাই, খেয়াল হলে তীর্থ পর্য্যন্ত করে আসত। ইয়ার-দোস্তও জুটে গেল। গাঁজায় দম দেওয়া আরম্ভ হল। দেখতে দেখতে পৈতৃক সম্পত্তি উপে গেল। তারপর এমন দিনও এল যে, সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল।

কিন্তু দারিদ্র্যে তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হল না। গাঁজা বন্ধ হল তো সিদ্ধির ধোঁয়া সুরু হল। আমাদের ওদিকে সিদ্ধি কোন মহার্ঘ বস্তু নয়, চারিদিকে সিদ্ধির জঙ্গল। পরমেসর সেই জঙ্গল থেকে খুব ঘন পাতা পেড়ে আনত, শুকিয়ে গুছিয়ে রাখত, নিজে খেত, ইয়ারদেরও খাওয়াত। তারপর বাড়ির দরজায় সব সময়ে একটা ঢোলক আর কয়েক জোড়া ঝাঁজর তৈরি। সন্ধ্যা হতে-না-হতে পরমেসরের আড্ডা একেবারে গুলজার। বারো মাস ত্রিশ দিন তার বাড়ির দোরে এই। হয়ত এমন হয়েছে যে সেদিন পেটে ভাত জোটেনি সেজন্য গান-বাজনা বন্ধ থাকবে না। রসিক ব্যক্তি। দোরের কাছে কিছু ফুলের গাছ নিশ্চয় থাকত আর সারা গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় 'মহাবীর ঝাণ্ডা'[২] পরমেসরের উঠোনে উড়ত। গ্রামের মাতব্বরেরা তার নিন্দা করতেন, তিরস্কার করতেন, তাকে গালিও দিতেন, কিন্তু বালক আর কিশোরের দল সর্ব্বদাই তার কাছে কাছে ঘুরত।

ক্ষেতে ধুঁধুলের লতায় ফুল হল, আর পরমেসরের দোল উৎসব এসে গেল। সরষের হলুদ রঙের ফুল দেখা দিলেই পরমেসরের হোলী গান আরম্ভ হল। এবং যেদিন বসন্ত পঞ্চমী এল সেদিন থেকে

২ মহাবীর ঝাণ্ডা—হনুমান অঙ্কিত পতাকা

সে যেন মাতলামির লাইসেন্স পেয়ে গেল। পেটে না খেয়ে সে পয়সা জমিয়ে রাখত এই দিনগুলোর জন্য। ঢাকের ওপর নতুন চামড়া দেওয়া হত, ঢোলকের ওপর নতুন করে গদ দেওয়া হত। সন্ধ্যা থেকেই যে 'হোলী' গাওয়া আরম্ভ হত অর্দ্ধেক রাত্রের পরও তার হাহা হিহি সারা গ্রামে শোনা যেত।

আর হোলীর দিনে ?

ভোর থেকেই পরমেসরের ঘরের দরজায় সব জোগাড়যন্ত্র দেখবার মত। মোষের দুধ যেখান থেকে হোক জোগাড় করত সে, চিনি নেই, আচ্ছা গুড়ই সই ! বিরাট একটা শিলে সিদ্ধির পাতা গোছায় গোছায় বাটত বা অপরকে দিয়ে বাটাত। সেটা জল, দুধ আর গুড় দিয়ে গোলা হত। নিজে ঢক্‌ঢক্‌ করে খেত, বন্ধুদেরও খাওয়াত। তারপর তাদের গ্রামে ঘোরা শুরু হত।—গুরুজনই হোক আর ছোটই হোক, সামনে যে পড়বে তার গায়েই কাদা। কেউ রাগ করে গালি দিলে পরমেসরের ভ্রূক্ষেপও নেই। দোলের দিনে গালাগালি তো আশীর্ব্বাদ ! সারা গ্রামের লোককে কাদা মাখিয়ে সে দল নিয়ে বেড়াতে বার হত গ্রামের সীমানায়। যদি কোন পথচারী এসে পড়ল, তার দুর্গতির আর সীমা থাকতো না। কাদা, গোবরজল তাদের আপাদমস্তকে বর্ষিত হতো। এই কাদা ছোঁড়ার জন্য প্রায় মারামারি হয়ে যেত। কেউ এদিকে পালাচ্ছে, কেউ ওদিকে দৌড়োচ্ছে, একদিকে হাসিঠাট্টার ফোয়ারা ছুটেছে আর অপর দিকে তর্জ্জনগর্জ্জন চলছে। এমনি করে যখন দুপুর গড়িয়ে গেল তখন পুকুরে জড়ো হওয়ার পালা। সেখানে খুব ডুবোন-চুবোন হল, তারপর বাড়ি।

আহারের পর পরমেসরের দল আবার প্রস্তুত। পরমেসর নিজে নিত ঢাক। নেশায় দুচক্ষু রক্তবর্ণ, মুখের কথা বলাই বাহুল্য, আবীরে

মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত লালে লাল। মাঝখানে পরমেসরের সেই ঢাক, আর তাকে ঘিরে চারদিকে ঝাল, করতাল, ঝাঁজর—গাইয়ে বাজিয়ে, আবার তাদের ঘিরে অসংখ্য দর্শক।

পরমেসর শুধু যে ঢাক বাজাত তাই নয়। হাত তো তালে তালে ঢাকের ওপর পড়তই কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গ যেন গান-বাজনার নেশায় মত্ত হয়ে যেত। কখনও ছুটছে, কখনও নাচছে, মুখে নানা রকম শব্দ করছে। পরমেসর তার কেন্দ্রে নেই, কিন্তু সাজসজ্জার কেন্দ্রবিন্দু সে। গ্রামের ধনীদরিদ্র সকলের দুয়ারে সে গাইত, বাজাত, হাসি-মসকরা করে শেষে যেত শিবমন্দিরে। সেখান থেকে অনেক রাত্রে চৈতী গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরত।

পরমেসর নেই। এখনও আমাদের গ্রামে দোলের উৎসব হয়, কিন্তু আর তেমন জমে কোথায়?

দুর্গাপূজায় দশদিন ধরে গ্রামে হৈ-চৈ চলত। আমাদের গ্রামে দশহরার দশ রাত্রি রোজাদের ভূত নামানর রীতি ছিল, এখন সে সব প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এই মৃতপ্রায় অনুষ্ঠানটার মধ্যেও পরমেসর যেন প্রাণসঞ্চার করেছিল। গ্রামের সমস্ত রোজাকে নিজের দুয়ারে ডেকে আনত। মাঝখানে পুড়ছে ধুনো। তার সামনে দুর্গার সাত বোনের নামে সাতটা জায়গায় চাল, সিঁদুর আর জবাফুল এক সারিতে রাখা হয়েছে। সেই সারির সামনেই একটা লাল ছড়ি রাখা হয়েছে। রোজারা গান করছে আর ঝাঁজ বাজাচ্ছে। গানের স্বর যখন বেশ উচ্চ গ্রামে উঠেছে তখন তাদের মধ্যে একজন রোজার ওপর ভূত, পেত্নী, ব্রহ্মদৈত্য, শাকচুন্নি বা কোন দেবী—অনেক আছেন এ শ্রেণীতে—এসে ভর করেন। ভূতে পেলেই রোজা গা দোলাতে আরম্ভ করে দিত। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর খুব দ্রুত। শরীর দোলাতে দোলাতে

লাল বেতটা দিয়ে সে নিজেরই শরীরে শপাশপ্ মারতে আরম্ভ করত। রোজা নিজের শরীরে যত বেত মারে ততই লোকেরা বলতে থাকে—'দেখো মহারাজ, ঘোড়াটা দুর্ব্বল, বেশী মেরো না।' অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর ভূত মহারাজের দয়া হয়। এবার রোজা বেত ফেলে দিয়ে কনুই দুটো মাটিতে আছড়াতে থাকে—এমন জোরে আছড়ায় যে গর্ত্ত হয়ে যায়। বাতি জ্বালিয়ে মুখের মধ্যে নিয়ে চিবিয়ে ফেলা, সরায় দাউদাউ আগুন জ্বলছে, সেটা হাতের ওপর রাখা এইরকম কত কেরামতি দেখান হচ্ছে। সর্ব্বশেষে ভূতের পারিশ্রমিক নির্দ্দিষ্ট হলে, মনের কথাটি এবং সেটি পূর্ণ করবার হদিশ জানিয়ে দিয়ে ভূত বিদায় নেয়। রোজার ওপর ভূত ভর করতেই দর্শকের মধ্যে সুরু হল কোলাহল, কত আজগুবি প্রশ্ন, কত রকম কামনা। পরমেসরের হাতে যেন ভূতের গলার দড়ি—রোজার সাহায্যে যে রকম ভূত চাই তা সে অনায়াসে আনাতে পারত।

কখনও বা সে নিজের উপরই ভূত আনাত। তবে তার নিজের ভূত কিছু আজগুবি ধরণের ছিল—তার হাবভাব নতুন ধরণের, নতুন রকম তার কথাবার্ত্তা, আর সে ভূতের আশীর্ব্বচনগুলোও এমন ধরণের হত সে শুনে লোকে হেসেই লুটোপুটি। পরমেসরের ভূত দিয়েই প্রায় ভূত-নাবান মজলিস সমাপ্ত হত—কারণ, তার ভূত হাঁউমাঁউ করে লোকেদের ওপর, বিশেষ করে ছোটদের তাড়া করত। দৌড়োদৌড়ি সুরু হয়ে যেত—হাসতে হাসতে লোকে প্রসন্ন চিত্তে পরমেসরের গুণগান করতে করতে বাড়ি ফিরত।

দেয়ালীর আলোকসজ্জা যারা করে করুক—'লুকাটী ভাঁজা'—অর্থাৎ জ্বলন্ত বাঁশ ভাঁজার কাজ তার। বাঁশের কঞ্চির শুকনো ছালগুলো জমা করে, বাঁশেরই ফোঁপড়াতে সেগুলো গুঁজে জ্বালান হত সন্ধ্যার

সময়, তারপর নিজের দলবল নিয়ে পরমেসর সারা গ্রাম আলোয় আলো করে দিত। দোলের 'ন্যাড়া পোড়া'র কাজও তারই ছিল একচেটে। সারা গ্রামের খড়, আগাছা, শুকনো ডাঁটা সমস্ত জমা করে একটা মস্ত বড় স্তূপ তৈরী করা হত। যারা স্ব ইচ্ছায় কাঠ-কাঠরা না দিত, তাদের জিনিষ চুরি করে আনা হত এবং স্তূপে জমা করা হত। সেই স্তূপে অগ্নিসংযোগ সে প্রায়ই নিজে করত—অনেক রকম কায়দা-কানুন করে সেটাকে জ্বালাত—নেভাত।

কার্ত্তিক পূর্ণিমা।—আর কি, অমনি পরমেসর সদলবলে চলল গঙ্গা-স্নানে। স্টেশনে এল—টিকিট কে কাটে! যখন হাতে পয়সা ছিল তখনও টিকিট কাটাকে সে রীতিমত অপমানজনক বলে মনে করত—তারপর তো পয়সার বালাই শেষই হয়ে গেল। সারা পথ টিকিট চেকারের সঙ্গে লুকোচুরি চলত, স্টেশনের কাছে ট্রেনের গতি যেমনি মন্দীভূত হল, ব্যস্ ট্রেন থেকে নেমে চম্পট। যদি বা কখনও অদৃষ্টক্রমে ষ্টেশনে পৌঁছে গেল তাহলে তারের বেড়া ডিঙিয়ে পলায়ন। ধাক্কা-ধাক্কি হলে মারপিটেও পেছপা নয়। ম্লেচ্ছকে পয়সা দিলে গঙ্গাস্নানের পুণ্য হয় না এই ছিল তার মত।

পালেজা ঘাট থেকে শোনপুরের মেলা পর্য্যন্ত পরমেসর কত রকম মজাই না করত। কখনও কপালে ত্রিপুণ্ড্র চন্দন দিয়ে গঙ্গাতীরে বসে স্নানার্থীদের সঙ্কল্প করাচ্ছে। কখনও নিজের দলের মাঝখানে সাধু বেশে লোকেদের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য বিভূতি বণ্টন করছে। কখনও ওঝা সেজে কত কুল কামিনীর সন্তান অভিলাষ পূরণের আশীর্ব্বাদ দিচ্ছে। এই সব করে যা পয়সা-কড়ি লাভ হত তা দিয়ে দলের সকলে মিলে মিষ্টান্ন ভক্ষণ হত এবং সঙ্গে গাঁজা টানা। এই সব তামাশায় কোন প্রবঞ্চনার বাসনা তার মনের মধ্যে থাকত না, এগুলো ছিল মনোরঞ্জনের জন্য, নিছক

আমোদ প্রমোদের জন্য। শঠতা তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল, তা না হলে বেচারীর এ দুর্গতি হবেই বা কেন? যারা পৃথিবীতে হাসতে হাসাতেই আসে, আর হাসি মুখেই বিদায় নেয়, সে ছিল তাদেরই একজন।

* * *

ইদানীং শেষে যখন তার অবস্থা বড়ই খারাপ হয়েছিল একদিন আমি তাকে ডেকে অনেক বোঝালাম—এ কি করছ তুমি? নিজের জন্য না হোক মা বাপের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, ছেলেপুলের প্রতি দায়িত্ব আছে। তুমি কিছু নির্বোধ নও, যথেষ্ট বুদ্ধি আছে তোমার—সে বুদ্ধি কাজে লাগাও। চাষবাস যদি ভাল না লাগে তবে অন্য কোন কাজকর্ম দেখো। না হয়, সহরে গিয়ে কোন ছোট খাট হোটেল কর, খেয়ে-দেয়ে কিছু পয়সা বেঁচে যাবেই। এমন অনেক লোকের উদাহরণও দিলাম তাকে, যারা এই ভাবে রোজগারপাতি করে নিজের পরিবারের ভরণ-পোষণ করেছে। আমার কথার কোন উত্তর তখন দিল না। কিছুদিন পরে শুনলাম পরমেসর আখড়া ঘাটের ওপর একটা হোটেল খুলেছে। সে হোটেলটা খোলবার জন্য তার নিজের কাছে তো কিছুই ছিল না, তবে তার স্ত্রীর শেষ অলঙ্কার সোনার কণ্ঠীটা বেচেছে।

কণ্ঠী বিক্রয়ের কথা শুনে আমার ভাল লাগল না, তবে ভাবলাম, হয়ত এইটাই তার ওপরে ওঠবার প্রেরণা স্বরূপ হবে। এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়—কিন্তু আমার সে ধারণা ভুল প্রতিপন্ন হল। অল্প কিছু দিন তার ব্যবসা চলল ভালই কিন্তু হাতে পয়সা হতে না হতেই সিদ্ধির বদলে গাঁজা ধরলো। ব্যবসা না চলার আর একটি কারণ সে দিয়েছিল অদ্ভুত ধরনের—'কাকা খাওয়াতে তো ভাল লাগে কিন্তু খাইয়ে-দাইয়ে কণ্টাহা[৩] দের মত পয়সার জন্য লেগে থাকা, বড় কঠিন কাজ। অবশ্য

৩ শ্মশান ব্রাহ্মণ

এতে সন্দেহ নেই যে কিছু পয়সা আমার গাঁজায় গেছে—কিন্তু বেশীর ভাগ পয়সাই আমার গ্রাহকদের কাছে। ...বেশ পরের জন্মে তারা জন্মাবে তাল গাছ হয়ে আর আমি ছাল হয়ে তাদের বুকে জন্মাব! —সব শেষ করে নেব। কেমন হবে তাহলে বলুন তো কাকা!' —হো হো করে হাসতে হাসতে বললে সে।

কাকার রাগ হল 'ও বেচারীর কণ্ঠীটা তুমি নষ্ট করলে।'

'কণ্ঠী কি হবে? এখন তো আপনিই বলেন যে সব লোকই সমান। সকলেরই যখন কণ্ঠী হবে তখন কি আপনারা ওকেও একটা কণ্ঠী গড়িয়ে দেবেন না? আর আপনাদের রাজত্ব যদি না ও হয়, এই যে কালো মুসাহর[৪] তার বৌ কোন কণ্ঠী পরে? কাকা, সুখ পাওয়া যায় অদৃষ্টে থাকলে কিংবা খাটলে। খাটতে আমি পারি না—কপালও আমার খারাপ। —সিদ্ধি খেয়ে হা-হা হি-হি করা আর হাসি খুশীতে দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া—কেবল এই কাজই আমি পারি। —আমার জন্য ভাববেন না।......'

আমি রেগে আগুন হয়ে তাকে আরও কিছু বলতেই যাচ্ছিলাম—সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে গাইতে গাইতে চলে গেল 'মালিক হায় সিয়ারাম—সোচ মন কাহে করে—' সীতারাম মালিক—ভেবে আর কি হবে। মনে হল সে যেন আমার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যঙ্গ করছে।

৪ মুসাহার—কথিত নিম্ন জাতি বিশেষ

বৈজু মামা

আমার বিশ্বাস আজও যদি আপনি পাটনা জেলে যান আর কোন পুরান কয়েদী, ওয়ার্ডার বা জমাদারের কাছে বৈজু মামার কথা জিজ্ঞাসা করেন তা হলে সে এক অদ্ভুত রকমের হেসে আপনাকে তার দু একটা গল্প নিশ্চয় শুনিয়ে দেবে। বৈজু মামা পাটনা জেলের একটি বিশিষ্ট প্রাণী। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে সে জেলের মধ্যে ঘর বেঁধেছে। ১৯৩০, ৩২, ৩৭, ৩৮, ৪০—যখনই আমি পাটনা জেলে গেছি, তখনই তার দর্শন লাভ ঘটেছে। তার সঙ্গে গল্প করেছি, কত কথা বলেছি, খুব হেসেছি কিন্তু প্রত্যেকবার হাসির পর এক বিচিত্র করুণা অনুভব করেছি।

ত্রিশ বছর ধরে সে জেলে বাস করছে, একথা শুনে আপনারা ভাবছেন হয়ত সে দ্বীপান্তরের সাজা পাওয়া আসামী, খুন বা ডাকাতি করে এসেছে। কিংবা হয়ত কোন বলাৎকারী বদমাইস, আর না হয় অন্তত একজন স্বভাব-অপরাধী তো বটেই। কিন্তু এ সমস্ত অপবাদ আমি খণ্ডন করবার দাবি করি। তার চেহারায় বা ব্যবহারে এমন একটি কিছু খুঁজে পাবেন না যাতে করে তাকে দাগী আসামী বলে মনে হতে পারে। তবু সে জেলে এবং ত্রিশ বছর ধরে জেলে আছে। এর অর্থ কি? আশ্চর্য!

প্রত্যেক বার একই অপরাধের জন্য তার জেল হয়। এবং একবারে দু বছরের বেশী সাজা তার কখনও হয় নি। ছাড়া পেয়ে যখনই যায়, সেই অপরাধই আবার করে আর আবার দুই বা এক বছরের সাজা পেয়ে জেলে আসে। কি সে অপরাধ? চুরি! ভাবছেন নিশ্চয় সে একটি পাকা চোর হয়েছে, একটা 'গ্যাং' তৈরি করেছে, বেশ বড় রকমের হাত সাফাই করে। এ তো জানা কথা যে কোন সাধারণ চোরও

জেলে দু একবার এলেই ওস্তাদ চোরে পরিণত হয়। কিন্তু সে এই শ্রেণীর চোর হলে তাকে নিয়ে কাহিনী লেখার কোন প্রয়োজন হত না। অপরাধ শাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার সখ আমার বিন্দুমাত্র নেই। বৈজু মামা এক অদ্ভুত রকমের চোর। চুরির দায়ে ত্রিশ বছর জেল খেটেছে কিন্তু একসঙ্গে ত্রিশটা টাকা কখনও হাতে পায় নি। না হলে তার কথা অনুসারেই বলছি, আপনারা তাকে জেলের মধ্যে কখনই পেতেন না। কবীরের সেই দোহা

'সিংহন কে লেঁহড়ে নহি, হংসন কে নহি পাত,
লালন কী নহি বোরিয়া, সাধু ন চলে জমাত' ১

বৈজু মামা আজ পর্যন্ত কোন দল পাকায় নি। তা হলে বুঝতে হবে কি সে সাধু? ছিঃ ছিঃ একটা পুরান চোরকে সাধু বলব আমি? এমন অবিনয় প্রকাশ করে সাধু সমাজে আমি মুখ দেখাব কেমন করে? নাঃ বৈজু মামা চোর, একটি পাকা ও পুরাতন চোর! সে সমাজের শত্রু, একজন প্রতিসামাজিক, দুষ্ট ব্রণ বিশেষ। এমন লোকের চিরদিন জেলে থাকাই মঙ্গল।

* * *

আমি উচ্চ শ্রেণীর কয়েদী ছিলাম। এই জেলে আমাদের সুখ সুবিধার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকায় আমাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। একদিন আমি হাসপাতালেরই ছোট বাগানটায় একটা আম গাছের ছায়ায় বসে কলম চালিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম একটা বুড়ো রুগী কয়েদী কম্বল মুড়ি দিয়ে আসছে। দুর্বলতা বশত সে ধীরে

১ সিংহের যূথ হয় না, হংসের ঝাঁক হয় না, রত্ন বোরা ভর্তি পাওয়া যায় না, এক আধটাই মেলে। সাধুও দল পাকিয়ে চলেন না।

ধীরে টলে টলে হাঁটছিল। এসে ফুল গাছের কেয়ারিতে বসে পড়ল, তারপর একবার অদ্ভুত সস্নেহ দৃষ্টিতে গাছগুলোর দিকে চেয়ে কম্বলের ভেতর থেকে একটা খুরপি বার করে ধীরে ধীরে গাছের গোড়ার ঘাস-আগাছাগুলোকে পরিষ্কার করতে লাগল। অল্পক্ষণই কাজ করেছে এমন সময় হাসপাতালের মেট হাতে ওষুধের গেলাস নিয়ে তাকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে হাজির, তাকে ঘাস ছিলতে দেখে বকে উঠল 'মামা এবার তুমি মরবেই।'

বুড়ো কয়েদী অপ্রস্তুত হয়ে গেল। খুরপিটা রেখে দিল, কম্বল সামলে ওষুধের জন্য হাত বাড়াল। তার হাত কাঁপছিল। কম্পিত কণ্ঠে মিনতিভরে সে মেটকে বলল :

'মাফ কর ভাই—ওষুধটা দাও।'

'ওষুধ কি ছাই দেব, ওষুধ খেয়ে হবে কি? খুরপি নিয়ে কাজে বসবার দরকার কি ছিল শুনি? বাগান জাহান্নমে যাক।'

'আ হা হা—এ তুমি কি বলছ। দেখছ না—চারটে দিন আমি অসুখে পড়েছি আর এই এত ঘাস কুটো জন্মে গেছে!'

'মামা তুমি কয়েদী, না সরকারের বলদ? পুরান কয়েদীর নাম তুমি ডোবালে। আমরা কি জেলে এসেছি কাজ করবার জন্য?'

'মেট ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ—একেবারে হক কথা। জেলের সর্বনাশ হোক, হাকিমদের সর্বনাশ হোক। কিন্তু ভাই আমি করি কি? না পারি বসে থাকতে, আর না সহ্য হয় ফুলগাছগুলোর এই দুর্গতি। মাফ কর ভাই, দাও ওষুধটা দাও। উঃ—শীত করছে।'

রুগী কয়েদীর চোখে জল—সে জল দেখলে চোখে জল আসে। মেটের চোখে জল ভরে গেল। 'এবার তুমি মরবে মামা' বলে সে ওষুধের পেয়ালা তার হাতে দিল। হাত কাঁপছিল তার, খানিকটা

ওষুধ থুতনি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল, খানিকটা গলার নিচে। ওষুধটা খেয়ে সে একবার থুতু ফেলল। তারপর আর বসতে পারল না, কম্বল মুড়ি দিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়ল। একটু পরে উঠে বসে গাছপালা-গুলোর দিকে আকাঙ্ক্ষাভরা স্নেহদৃষ্টিতে তাকাল, তারপর খুরপিটা হাতে নিয়ে হাসপাতালের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল। এবার আমি তার দিকে মন দিয়ে দেখলাম, বয়স বছর ষাট হবে, তামাটে রঙ, বলিরেখাঙ্কিত মুখ, চুলগুলো সব সাদা, কিন্তু যখন রোগের দুর্বলতার জন্য হাঁটতে তার পা দুটো কাঁপছে তখনও সে সোজা হাঁটছে, যেন জোয়ান মদ্দ।

* * *

স্বভাবতঃই আমি সে কয়েদীর প্রতি আকৃষ্ট হলাম—ইনিই স্বনামধন্য বৈজু মামা। এই জেলের কয়েদীদের মামা, ওয়ার্ডারদের মামা, জমাদারদের মামা—অর্থাৎ মনে করুন সারা পাটনা জেলেরই মামা।

তারপর থেকে বৈজু মামার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হল। ইতিমধ্যে তার অসুখ সেরে গেছে। সে নিজের খুরপি কোদাল নিয়ে সারা দিন এখানে ওখানে কাজ করত আর আমি তারই হাতে তৈরী করা বাগানের একটা আম গাছের তলায় বসে তার কাজ দেখতাম। ক্লান্ত হলে সে আমার কাছে এসে বসত। বিড়িও খেতো না, খৈনিও নয়। আমি আর কি দিয়ে তার অভ্যর্থনা করব, জেলের সবচেয়ে বড় আদর অভ্যর্থনা এই দুটো বস্তু দিয়েই হয়ে থাকে। যাই হোক, আমার কাছে এসে সে 'সুরাজ' [২] আর 'গনহী বাবা'র [৩] খবরাখবর জানতে চেষ্টা করত —আর আমি তার কাছ থেকে তার নিজের জীবনের কাহিনী জানবার

২ সুরাজ—স্বরাজ

৩ গনহী বাবা—গান্ধী বাবা

চেষ্টা করতাম। খুব সাবধানে, কারণ বুঝলাম বৈজু মামা নিজের জীবন-কাহিনীর পাতাগুলো সহজে খুলতে চাইত না। সাধারণ কয়েদীদের মত নিজের কাহিনী অতিরঞ্জিত করে বলা তো দূরের কথা, অনেক কষ্টে যদি বা একটু বলত তাও মাঝপথেই থেমে যেত। লাজুক কিশোরীর মত সেই বলিরেখাঙ্কিত গালে একটু যেন রং ধরত। কখনও বা রেগে বলে উঠত—'বাবু এ পাপ কাহিনী আর আপনি শোনেন কেন ? চোর বদমাইসের কাহিনী কি আর শোনবার মত ?'

কিন্তু বহু চেষ্টায় ধীরে ধীরে আমি তার জীবনের ছিন্ন সূত্রকে জোড়া দিয়েছি।

বৈজু মামা পাটনা জেলার বাড় সাবডিভিশনের লোক। একজন সাধারণ কিষান ছিল। একবার অবস্থা এমন হল যে বলদের অভাবে তার চাষবাস আটকে গেল। কোথাও থেকে ত্রিশ টাকা ধার নিয়ে গঙ্গার ওপারে গেল বলদ কিনতে, শুনেছিল ওদিকের বলদ নাকি ভাল আর দামও সস্তা। গঙ্গা পার করে এসে কয়েকটা গাই বলদের হাটে ঘুরল, যথাসম্ভব অল্পমূল্যে বলদের খোঁজ করছিল। এই ঘোরাঘুরিতে তার মাথায় যেন শয়তান চাপল। ও দিকে লোকে গ্রীষ্মকালে বলদ বাইরে বাঁধে এবং বিশেষ কোন পাহারার ব্যবস্থাও করে না। পাটনা জেলায় এরকম রেওয়াজ নেই। শয়তানটা তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল : 'রাত্রে এই থেকে একটা বলদ খুলে নিয়ে গঙ্গা পার করে সরে পড় না কেন ?' পছন্দ হল—এ যুক্তি। বলদও পাওয়া যাবে, পয়সাও বেঁচে যাবে ; চাষ হবে অথচ ধার হবে না, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। লোকে জিজ্ঞাসা করলে বলা যাবে—'বলদ কিনেছি ব্যস আর কি !' হলুদ ফটকিরি পড়ল কি না পড়ল রঙ হয়ে গেল চোখা—বৈজু মামা একেবারে তৈরি।

তারপর একদিন রাত্রে সে একটি গ্রাম থেকে বেশ ভাল দেখে একটা বলদ খুলে নিয়ে রওনা হয়ে গেল। যখন বলদের দড়ি খুলছিল তখন তো কেবল হাতটাই কাঁপছিল কিন্তু দিনের আলোয় তার সর্বাঙ্গে কাঁপন ধরল। ঠিক করে হাত পা ওঠাতে পারছে না। লোক দেখলেই ভাবে তার খোঁজ করছে, সব চোখগুলোরই নজর তার দিকে, সকলে যেন তার দিকেই অঙ্গুলির ইসারা করছে—সকলেই তার কথা কানাকানি করছে। সন্ধ্যার সময় সে একটা গ্রামের চটিতে পৌঁছল। ইতঃমধ্যে তার শরীরের প্রতিটি গ্রন্থি যেন আলগা হয়ে গেছে। ক্ষিদে আর ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। বলদটাকে একটা গাছে বেঁধে, দোকানদারের কাছ থেকে ঘটি আর দড়ি দিয়ে কুয়োর পাড়ে গেল। হাত মুখ ধুচ্ছে এমন সময় দেখে এক পাহারাওলা ঐ দোকানেই এসে বসেছে! আঁ, আমার খোঁজেই এল নাকি এ? তার চেয়ে বলদটাকে ফেলে রেখেই পালান যাক না কেন…? ……কিন্তু তা হলে তো ধরা পড়বার সম্ভাবনা বেশী! আর পারব কি পালাতে? ……তা ছাড়া এমন বলদ কি এ জীবনে আমার কপালে আর জুটবে? …… না না, ও আমার খোঁজে আসে নি।

এই প্রকার অনেক ভেবে চিন্তে সে দোকানে গেল। দোকানদারের কাছে দু পয়সার ছোলা কিনল—ছোলা মুখে দিচ্ছে—পেটে গিয়ে যেন খই হয়ে যাচ্ছে। ছোলা কেনবার সময় তার মুখে মগহী বুলি শুনে স্বভাবতই দোকানদার তার গাঁ ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আর ঘরের কথার সঙ্গে বলদের কথাও উঠল। কথার মাঝেই পাহারাওলা জিজ্ঞাসা করে বসল—"বলদটা কি তোমার? বেশ বলদ। কতয় কিনলে"—প্রশ্ন শুনেই তো মামার আক্কেল গুড়ুম। আর গোটা দুই তিন প্রশ্ন, ব্যস। তারপর আর কি! পাহারাওলা দৌড়ে গিয়ে তাকে

ধরে ফেলল: 'চোর কোথাকার! এই বলদ চল্লিশ টাকায়, আর বাজিতপুরের হাট বুধবারে বসে?'

বলদ গেল, টাকাগুলোও কেড়ে বিগড়ে নিয়ে নিল, প্রহারও কম খেতে হল না। সমস্তিপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এক বছরের সাজা দিল। সাজা কেটে ফিরে আর মুখ দেখায় কেমন করে! 'বংশে কলঙ্ক দিয়েছি'।

'বংশে কলঙ্ক? বৈজু মামা তুমি কি জাত?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। ওর চেহারা দেখে মনে হত ভাল ঘরের। এ প্রশ্ন শুনে সে যেন ঘাবড়ে গেল। তারপর বলল: 'জেলের টিকিটে দোসাধ লেখা আছে।'

'জেল টিকিটে যাই না কেন লেখা থাক, আসলে কোন্ জাত তুমি? দোসাধ তো নও……'

বার বার জিজ্ঞাসা করায় বৈজু মামা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তার মুখের রেখাগুলো যেন আরো বেশী গভীর হয়ে গেল।

'চোরের আবার নাম ধাম জাত পাত আছে নাকি? চোর—চোরই। কিন্তু হাকিমের সামনে তো কিছু বলতে হবে—তাই ঐ লিখিয়ে দিলাম।' কণ্ঠে তার বেদনার স্বর।

'তা হলে কি ও নামও তোমার নয়?' বিস্ময়ে তার চোখ দুটো ঝলক দিয়ে উঠল, চট করে বলে ফেললে—'এ আপনি কেমন করে জানলেন আমার নাম বৈজু নয়? আপনি কোন মন্তর তন্তর জানেন নিশ্চয়!'

শেষ পর্যন্ত বৈজু মামা নিজের প্রকৃত নাম আর গ্রামের নামটাও জানাল, কি জাত তাও বলল—ঘরের সব খবরই জানাল। আমি বললাম: 'যা হবার তা হয়ে গেছে—। তুমি পৈতে রাখ না কেন? বামুন, ছত্রীর চিহ্নটা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।'

আমার কথা শুনে তার যেন আর একটা আঘাত লাগল। কাতর ভাবে বললে: 'আমি তো ভ্রষ্ট হয়েই গেছি, পৈতেটা অপবিত্র করে আর লাভ কি! এই একটা অপরাধ কি সামান্য যে আরও অপরাধ বাড়াব?'

তার উত্তর শুনে আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে জেলে যে ছোঁয়া ন্যাপা হয় তাতে জাত যায় না। পৈতে রাখা তার উচিত। এবার সে বললে: 'জেলের কথা নয়। বাইরে নেশাটা আসটা করতে হয় বাবু।'

'কেন, বাইরে তুমি মদ তাড়ি খাও নাকি?' শুনে তার সব বাঁধ যেন ভেঙ্গে গেল। জলভরা কণ্ঠে বলে উঠল—'হায় বাবু আপনি বড় সরল, কিছুই আপনি জানেন না। নেশা না করে কি চুরি করা যায়? নিশাচরের কাজের জন্য চাই নেশা।'

আর কোন কথা না বলে সে আমার কাছ হতে চলে গেল।

* * *

আমি খবর পেয়েছিলাম যে তার বাড়ীতে এখনও চাষবাস হয়—আর বেশ ভালই হয়। ভাই মারা গেছে, ত্বটি ভাইপো আছে, তাদের ছেলেপুলে আছে। আমি বৈজু মামাকে কত বোঝালাম—'পুরান কথা ভুলে যাও। এবার ছাড়া পেলে গঙ্গাস্নান করে বাড়ি চলে যাও। ভাইপোদের কাছে সব কথা খুলে বল, তাদের সঙ্গেই গিয়ে থাক। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে কে জানে কখন কি হয়! জেলের ভেতরে ম'লে দেহটারও সদগতি হয় না।'

শেষ কথাটা তার মনে বড় লাগল। একদিন মন খুলে বললে:

'কি আর বলব বাবু, কতবার যে এই কথাই ভেবেছি। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কতবার বাড়ির পথে পা দিয়েছি। কিন্তু বক্তিয়ারপুর

পৌঁছে পা যেন আর এগোয় না। ভাবি শুধু হাতে বাড়ি যাই কি করে? ভাইপোরা না হয় বুঝবে কিন্তু তাদের বউরা তো পরের মেয়ে—তারা ভাববে এ বুড়ো আবার কোথা থেকে এল? কিছু নিয়ে গেলে তারাও মনে করবে—হাঁ কিছু তো এনেছে—। অন্ততঃ একটা গোরু কিনে যদি নিয়ে যেতে পারতাম! একটা গোরু—ত্রিশ টাকায় তো ভাল ভাল গোরুই পাওয়া যায়। কিন্তু টাকা কোথা থেকে আসবে? —ভাবি, চোর তো আছিই, আর একবার যদি হাত সাফাই করতে পারি! কিন্তু যতবারই এমন করেছি ততবারই টাকাটা পুরো হবার আগে ধরা পড়ে গেছি। তারপর—আবার যে-কে-সেই!'

ওঃ ত্রিশ টাকা। ত্রিশ টাকায় বলদ, ত্রিশ টাকায় গোরু! আর এই ত্রিশটি টাকার জন্য একটা জীবনের ত্রিশটি বছর নষ্ট হয়ে গেল। বেচারা ত্রিশের গোলকধাঁধায় কি ভাবেই না ফেঁসে গেছে। এই সব ভাবছি এমন সময় বৈজু মামা বলে উঠল—'আরো একটা কথা বাবু। যতবারই জেলের বাইরে যাই, এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে, দেখে শুনে দিনটা তো কেটে যায় কোন রকমে, কিন্তু রাত কাটে না। ঘুমোবার চেষ্টা করি, মনে হয় যেন জেলের গাছপালাগুলো আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই আম গাছ, পেয়ারা গাছ, নিম গাছটা, ঐ জাম গাছ—এ সব আমার নিজের হাতে লাগান বাবু। আমিই এদের চারাগুলো পুঁতেছি, গোড়ায় জল দিয়েছি, আগাছা পরিষ্কার করেছি। দেখতে দেখতে আজ এগুলো কত ডালপালা নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর এই—বেলা, গোলাপ, গ্যাঁদার প্রথম চারা আমি ছাড়া আর কে পুঁতেছে! যত্ন করে বাড়ানো—সেও এই বৈজু। জেলের বাইরে যখন থাকি রাতে এইগুলোই আমায় ডাকতে থাকে, সত্যি বলছি বাবু, ঘুম কিছুতেই আসে না। ভাবি, আমের সেই ডালটা কেউ মুচড়ে দিল বুঝি, নিম

গাছটা থেকে দাঁতন ভেঙে ভেঙে গাছটা বুঝি মেরেই ফেলল। এই বেলা-গোলাপের গাছগুলো জল না পেয়ে, যত্ন না পেয়ে নষ্ট না হয়ে যায়। —আর কি, কিছু এদিক ওদিক করে আবার ছুটে জেলে আসি!'

বৈজু মামা কথা বলছে। আমি ভাবলাম স্বপ্ন দেখছি না তো! সত্যি কি আমি জেলে? আমার পাশে বসে বসে যে লোকটা এই সব কথা বলে চলেছে সে কি সত্যি চোর? চোরের চেহারা কি এমনই নিরীহ হয়—তাদের কথা কি সত্যি এমন হয়? তাদের কাজও কি এই রকম? যে লোকটা গাছপালার সঙ্গে এমন একাত্ম হয়ে গেছে, চারাগুলো যাকে ডাকে সে কি কখনও নিম্নকোটির অধম অপরাধী হতে পারে? একে যদি অপরাধী বলতে হয় তা হলে অপরাধী শব্দটার পরিভাষা পরিবর্তন করে দেওয়া উচিত।

* * *

'বৈজু মামা, হোলীর গল্পটা বাবুকে নিশ্চয় শুনিয়ে দিও' যখন মেট বলল—দেখি বৈজু মামার মুখে একটা হালকা হাসির আমেজ, দাঁতগুলো একবার প্রকাশ হল—বৈজু মামার সেই ঝকঝকে দাঁত—ত্রিশ বছর জেলের রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে আধখানা করে ক্ষয়ে গেছে কিন্তু ভাঙ্গে নি একটাও। 'ও মেট ভাই, বাবুর সামনে আর লজ্জা দাও কেন?' তারপর, এদিক ওদিক নানা কথা বলে আমায় ভোলাবার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি ছাড়লাম না।

—একবার বৈজু মামার জেল থেকে ছাড়া পাবার দিন পড়ল ঠিক দোলের দিনই। দোলের দিন—বছরে এই একটি মাত্র দিন, জেলের মধ্যে মণ্ডা মেঠাই তৈরি হয়। 'মণ্ডা মেঠাই' শুনে হয়ত অবাক হচ্ছেন আপনারা, কারণ জেলের মধ্যে ভাতে থাকে কুঁড়ো আর রুটিতে কাঁকর,

ডালে কেবল খোসা আর তরকারির নামে ঘাসের ডাঁটাগুলো সেদ্ধ করে দেওয়া—এ হেন স্থানে 'মণ্ডা মেঠাই' কি ধাঁচের হয়ে থাকে বুঝেই দেখুন। —কিন্তু তবুও তা বিশেষ রান্না তো বটে—মণ্ডা মেঠাই তো। আটায় গুড় দিয়ে অল্প জলে গুলে সরষের তেলে ভেজে তৈরি হয় মাল-পুয়া, জল দিয়ে চাল গলিয়ে হয় পরমান্ন, এ খাবারের নামেও কয়েদীদের জিভে জল কম ঝরে না। মাসের পর মাস এরই জন্য কত প্রতীক্ষা। এই দিনটির কল্পনাতেই বৈজু মামার জিভ দিয়ে কত নাল ঝরেছে। আর খবর পাওয়া গেল কিনা এই দোলের দিনেই তার রেহাই-এর তারিখ! ওঃ, কি দুঃসংবাদ!

বৈজু মামা জমাদারের কাছে ধীরে ধীরে অনেক অনুনয় বিনয় করল—জেলার বাবুকে বলে কয়ে রেহাই-এর তারিখ কেবল একটি দিন পিছিয়ে দেওয়া হোক। জমাদার প্রথমে তাকে ভাল কথায় বুঝিয়ে না পেরে শেষে ধমক দিয়ে বলল যে এরকম করা সম্ভবপর নয়। কি আর করা যায়—জেল থেকে ছাড়া পাবার সেই তারিখ এল। তাকে যখন জেল ফটকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন দেখে মালপুয়া তৈরির জন্য সরষের তেল আর কড়াই ভেতরে পাঠান হচ্ছে। তার চক্ষু ছলছল—কড়াই আর তেল দেখে। জেলারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল—তাকে না চেনে কে? জেলার সাহেব ভাবলেন এ অশ্রু নিশ্চয় আনন্দাশ্রু—অথবা পশ্চাত্তাপেরই অশ্রু। বলে বসলেন—'কি বৈজু আর তো জেলে আসবে না……কি বল?……ঠিক, ঠিক আর এসব নয়…বুড়ো হয়েছ।' তাঁর কথা শেষ হতে না হতে বৈজু মামার চক্ষে শ্রাবণ ভাদ্রের ধারা নেমে এল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল: 'বাবু, আমার কপাল ভেঙেছে বাবু…।'

জেলার সাহেব একজন ভদ্র মুসলমান, তিনি শুনে ভড়কে

গেলেন। কেন, ব্যাপার কি? 'কি হয়েছে বল বৈজু।' কোন দুঃসংবাদ এসেছে না কি—ভাবতে লাগলেন মনে মনে। বৈজু মামা বললেন: 'হুজুরের এতে আর কি হাত আছে? আমারই কপাল ভেঙ্গেছে।'

'হল কি বৈজু?' জেলার সাহেবের কৌতূহলে এবার করুণার মন্দাকিনী মিশেছে—আর এদিকে বৈজু মামার চোখে অবিরত বর্ষণ হচ্ছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে: 'হুজুর, যখন তেল আর কড়া জেলের ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে, হায়! আমায় তখন জেলের বাইরে পাঠান হচ্ছে। পরবের দিনে আমায় বিদায় করা হচ্ছে হুজুর'—আর বলতে পারল না সে। জেলার হো হো করে হেসে নিজের পকেট থেকে একটা টাকা বার করে বৈজু মামার হাতে দিয়ে বললেন: 'যাও, বাজার থেকে খাবার কিনে খেয়ে নিও।' কিন্তু সে রূপার চাকতির প্রতি বিন্দুমাত্র মোহ মামার হল না। টাকাটা জেলার বাবুর পায়ের কাছে রেখে মিনতি করল—কেবল আর একটি দিন তাকে জেলে থাকতে দেওয়া হোক। জেলার বললেন এ কায করতে তিনি অসমর্থ। বার বার বলা সত্ত্বেও টাকাটা না নিয়েই ধুতির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে বৈজু মামা চলে গেল।

বাইরে দোলের উৎসব, হৈ চৈ। রঙ আবীর উড়ছে—গান-বাজনা হচ্ছে। জেল থেকে যে তিন আনা পয়সা পেয়েছিল তাই দিয়ে বৈজু মামা ছাতু কিনে খেল। সারাদিন এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে তামাসা দেখে কাটল। সন্ধ্যাবেলায় স্টেশনের মাল গুদামের সামনে গিয়ে শুয়ে রইল। কিছুটা চুপচাপ হয়ে যাবার পর একটা গাড়ির কাছে বাঁধা বলদ দুটোকে খুলে নিয়ে চলতে আরম্ভ করল। সারাদিন হৈ চৈ করে গাড়োয়ান এমন ঘুম ঘুমোচ্ছিল যে তার আর কোন জ্ঞানই

নেই। বৈজু মামা এবার কি করে—সে নিজেই চেঁচিয়ে বলতে লাগল: 'ও গাড়োয়ান ওঠ্ ওঠ্, কি বোকার মত ঘুমোচ্ছিস—এদিকে বলদ চোরে নিল।' 'বলদ' শুনেই গাড়োয়ান তড়াক করে উঠে যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল সেইদিকে দৌড়তে আরম্ভ করে দিল—ওকে দৌড়তে দেখে বৈজু মামাও পালাবার ভান করল। ধরা তো পড়লই, দু চারটে ঘুঁসিও খেল, রাতটা কাটল হাজতে আর ভোর হতেই আবার জেলে হাজির।

সারা জেলে রটে গেল বৈজু মামা এসে গেছে। বৈজু মামা জেলে এল সোজা মেটের কাছে—'কোথায়: আমার মালপুয়া কোথায়, নিয়ে এস মেট ভাই।' মেট হাসতে লাগল। বৈজু মামা যাবার সময় তাকে বলে গিয়েছিল যে তার জন্য যেন দু চারখানা মালপুয়া চুরি করে লুকিয়ে রাখে, পরদিন সে নিশ্চয় আবার জেলে আসবে। তার সে 'নিশ্চয়' যে এত নিশ্চিত এ আশা মেট করে নি। সে উত্তর দিল: 'মালপুয়া রাখি নি তো।' শুনেই বৈজু মামার চোখে অশ্রুর সাগর উথলে উঠল। ওঃ, ঐ মালপুয়ার জন্য রাতে গাড়োয়ানের হাতের কত ঘুঁসিই হজম করেছে, সারা রাত হাজতে কেবল ঐ মালপুয়ার স্বপ্নই দেখেছে। কিন্তু হায় রে মেট ভাই! কি কপাল তার…!

এ শুনে মেট ভাই-এর চোখও ছলছল। নিজের জন্য যে মালপুয়া ক'খানা চুরি করে লুকিয়ে রেখেছিল তাই এনে বৈজু মামাকে দিল। আর বৈজু মামা সেই বাসি—কাঠের মত শক্ত তেলের পুয়াগুলো কুরে কুরে খেতে লাগল। তার চোখের জলের সঙ্গে মিশে সেগুলো নরম আর নোনা হয়ে যেতে লাগল!

* * *

এবার কেমন ভাবে জেল হল সে কাহিনীও বড়ই করুণ।

সেবার বৈজু মামা স্থিরনিশ্চয় করে জেল থেকে বার হয়েছিল যে ত্রিশটা টাকা যে কোন প্রকারে যোগাড় করবে—আর সেই টাকা দিয়ে একটা গোরু কিনে নিয়ে ভাইপোদের কাছে যাবে।···প্রায় ত্রিশ বছর পরে···গোরুর দড়ি হাতে ধরে যখন সে নিজের গ্রামে ঢুকবে তখন গ্রামটা কেমন দেখাবে, লোকে তাকে চিনতে পারবে কি না, কেমন করে সে নিজের পরিচয় দেবে···ইত্যাদি কল্পনায় বিভোর হয়ে বৈজু মামা জেলের বাইরে পা দিল।

প্রথমে মনে হল এবারে অদৃষ্ট অনুকূল। বড় বড় চুরির বিপদও বেশী, তা ছাড়া এবারে আর বিপদ ডাকার ইচ্ছাও ছিল না। এই সব ভেবে ত্রিশ টাকার জন্য ছোটখাট চুরি করতে আরম্ভ করে দিল। একটা হোটেল থেকে দুটো ঘটি সরাল—দু টাকায় বেচল। এক মন্দির থেকে দুটো কম্বল সরিয়ে তিন টাকায় বেচে দিল। এক উকিলবাবুর বারাণ্ডা থেকে একটা শাল চুরি করে সেটা বেচে চার টাকা পেল। সবচেয়ে বড় দাঁও মারল এক গুদাম থেকে এক বোরা শুকনো লঙ্কা চুরি করে—তাতে নগদ বারো টাকা লাভ হল। এই রকম করে, এই ভাবে বৈজু মামার কাছে একুশ টাকা হল। আর কেবল ন'টি টাকা বাকি। লঙ্কা চুরি সবচেয়ে সুবিধার। একদিন যখন সহরের বাইরে শৌচ কর্মে যাচ্ছিল তখন দেখে একটা ক্ষেতে লাল লঙ্কা ফলেছে। কে জানে—সহরে চুরি করতে গিয়ে কোন্‌দিন ধরা পড়ে যায়—তার চেয়ে রাতে লঙ্কার ক্ষেতে এসে কিছু কিছু করে লঙ্কা তুলে বেচলে কেমন হয়। —দিন দশ পনেরো লাগবে হয়ত—কিন্তু বিপদ তো কম। এই সব ভেবে চিন্তে সে প্রতি রাত্রে লঙ্কার ক্ষেতে গিয়ে এক থলি লঙ্কা নিয়ে কিষানদের মতই বাজারে বেচতে লাগল।—এবার এমনি করে তার

কাছে হল ছাব্বিশ টাকা—আর কেবল চারটি টাকা বাকি—। কেবল চারটি টাকা।

যাত্রার সীমান্তে এসে পথিকের পদক্ষেপ দ্রুততর হয়ে ওঠে। একদিন বৈজু মামা এত লঙ্কা তুলে আনল যে সওয়া টাকা দাম পেল। এবার কেবল তিনটি টাকা হলেই হয়।

'তিন'—ওঃ কি অশুভ সংখ্যা এই 'তিন'। সে রাত্রে মামা যখন ক্ষেতে পৌছাল তাকে ঘিরে ফেলা হল। বেচারা কিষান কিছুদিন ধরে হয়রান হয়ে পড়েছিল। এ কি হচ্ছে—তার ক্ষেত যে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। ক'দিন ধরে ই ওৎ পেতে ছিল, আজ চোরকে দেখে তাড়া করল। মামা আর পালাবে কোথায়। তার একটি বুদ্ধি এল। যে লঙ্কাগুলো পেড়েছিল সেগুলো এদিক ওদিক ফেলে দিল আর শৌচের ভঙ্গীতে বসে পড়ল। চারদিকে লোক ঘিরে আছে—সে চুপচাপ।—একজন বললে : 'উঠবি, না লাঠি চালাব।'

এবার কি আর করে—মামা তো দাঁড়িয়ে উঠল, ধুতির কাছাটা শৌচ কাজের মত করে খুলে নিয়েছিল। মনে ভাবলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময় পাশে রাস্তা দিয়ে একটা মোটর গাড়ি গেল, আর তার আলোয় আশেপাশের ছড়ান লঙ্কাগুলো দেখতে পাওয়া গেল।

হেসে বললে মামা : 'ভয়ের চোটে পেচ্ছাপও তো হয় নি বাবু।' তারপর আর কি—চুরি পরিষ্কার ধরা পড়ল। মামাকে আবার থানায় হাজির করা হল, আবার সেই আদালত, আবার বাড়ের ছোট জেল—ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত—।

এবার কিন্তু একটু বিশেষত্ব ছিল তার কেসে। পুলিশ জেনে গিয়েছিল যে বৈজু মামা দাগী—তাই এবার তার ওপরে সেশন চালাবার

ব্যবস্থা হতে লাগল। নবযুবক ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের কথাই মেনে নিল। দারোগা গালি দিয়ে বললে : 'বুড়ো, এবার তোর পাঁচ বছরের ঘানি।'

সেশন জজ ছিলেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। যখন তিনি মামার কাছে তার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, মামা অস্বীকার করতে পারল না। মিথ্যে বলে কেমন করে? তবে হাঁ, একটা আবেদন জানাল সে।

'হুজুর, শুনেছি পঁচিশ বছর সরকারের জন্য খাটলে "পিনসিন" দেওয়া হয়? হুজুরও তো বুড়ো হয়েছেন এবার হুজুরও পিনসিন পাবেন। আমি ত্রিশ বছর জেলে থেকে সরকারের কাজ করে দিয়েছি! দোহাই হুজুর, ধর্ম সাক্ষী কাজে কখনও কামাই দিই নি। জেলার সাহেব, জমাদার সাহেব সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন। বৈজু কাজ না করে কখনও রুটি খেতে পারে নি হুজুর। এই ত্রিশ বছর ধরে এত মেহনত করেও কি এ বুড়োর "পিনসিনে"র হক হয় নি? দোহাই হুজুরের, দোহাই মা বাপ, আপনি ন্যায় করুন। হুজুর যদি ন্যায় না করেন তা হলে এ বুড়ো আর কোথায় যাবে?'

অদ্ভুত যুক্তি! হৃদয়কে প্রভাবিত করে হয়ত, কিন্তু মস্তিষ্কে? জজ তো কানুনের কেতাবে বাঁধা। সেই আইনের কেতাব অনুসারে সাজা দেবার জন্য যা চাই—এ ক্ষেত্রে তার সবই মজুত—নিজের চোখে দেখেছে এমন সাক্ষী, আসামীর অপরাধ স্বীকৃতি। অপরাধের কারণ খুঁটিয়ে দেখবার উপায় জজের আছে কি? এ অপরাধে কতখানি সমাজের হাত আর কতখানি বা ব্যক্তির, ব্যক্তির কর্মে পরিস্থিতির কতটা হাত—এসব ভাববার অবসরই বা কোথায়? তা ছাড়া মানুষের মধ্যে যে মানবত্ব, সেই মানবত্বকে মাথা তোলবার, অপরাধীকে ঠিক পথে চলতে সাহায্য করবার বাসনা বা চিন্তাও তো সেই আইনের বই-এ একেবারে নিষিদ্ধ। জজ বেচারা বৃদ্ধ, সহৃদয় কিন্তু যে কেতাব তাঁকে আহার

যোগাচ্ছে, বৃদ্ধাবস্থায় আরামে কাটাবার জন্ম ব্যবস্থা করেছে তাকে তিনি উপেক্ষা করবেন কি করে? হাঁ তবে তিনি সম্ভবতঃ সেক্সপিয়ারের "মার্চেণ্ট অভ ভেনিস" পড়েছিলেন—তাই নিজের ন্যায়ের ওপর দয়ার একটা ছোপ লাগিয়ে দিলেন।

এবার দয়া করে তাকে একটি বছরেরই সাজা দেওয়া হল।

সুভান খাঁ

'তোমার আল্লা কি পশ্চিম দিকে থাকেন? পূর্ব দিকে থাকেন না কেন তিনি?'

সুভান খাঁর লম্বা, সাদা ধপধপে রোয়াবদার দাড়ির মধ্যে ছোট ছোট আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তার প্রশস্ত ললাটের ওপর একটা উল্লাসের ঝলক আর সঘন দাড়ি গোঁফের মধ্যে চাপা-পড়া পাতলা ঠোঁট দুখানায় মুচকি হাসি খেলে গেল। সে তার দীর্ঘ ডান হাতখানা আমার মাথায় বুলোতে বুলোতে বললে:

'নারে খোকা, আল্লা তো পূর্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ চারদিকেই আছেন।'

'তা হলে তুমি কেবল পশ্চিম দিকেই মুখ করে নমাজ পড় কেন?'

'পশ্চিম দিকের দেশেই আল্লা রসুল [১] এসেছিলেন কিনা তাই সেই আমাদের তীর্থ। সেই দিকে মুখ করে তাই আমরা আল্লাকে ডাকি।'

'সে তীর্থ এখান থেকে কত দূর?'

১ রসুল—পয়গম্বর

'অনেক দূর।'

'যেখানে সূর্য অস্ত যান ?'

'না, তার চেয়ে একটু কাছেই।'

'তুমি সে তীর্থে গেছ সুভান দাদা ?' দেখি সুভান দাদার বড় বড় চোখে জল ভরে গেছে, মুখখানা লাল। সে ভাবে বিভোর গদগদ কণ্ঠে বললে : 'সেখানে যেতে যে অনেক খরচ পড়ে খোকা। আমি গরীব মানুষ। এই বুড়ো বয়সেও এত পরিশ্রম করি—যদি কিছু পয়সা বাঁচিয়ে একবার সেই পবিত্র তীর্থে যাত্রা করতে পারি।'

তার চোখ দুটি দেখে আমার শিশুহৃদয় চিন্তায় হাবুডুবু খেতে লাগল। আমি তাকে বললাম : 'মামার কাছ থেকে ধার নাও না কেন দাদা ?'

'ধারের পয়সায় তীর্থে গেলে ফল হয় না খোকা। আল্লার ইচ্ছা হলে দু'এক বছরে কোন রকমে সেখানে যাবার মত টাকা জমিয়ে ফেলতে পারব।'

'সেখান থেকে আমার জন্যে কি আনবে ?'

'সেখান থেকে লোকে খেজুর আর ছুয়ারা আনে।'

'আচ্ছা আচ্ছা, আমার জন্যে ছুয়ারাই[২] এন। কিন্তু এক ডজনের কম হলে হবে না।'

সুভান দাদার সাদা গোঁফ দাড়ির মধ্যে দিয়ে তার দাঁতগুলো হাসিতে ঝকঝক করছে। সে কিছুক্ষণ আমায় আদর করল। তারপর একটু থেমে বলল : 'আচ্ছা এবার খেলা করগে যাও, আমি নিজের কাজ শেষ করে নিই। মজুরীর জন্য পুরো কাজ না করলে খোদা নারাজ হবেন।'

২ ছুয়ারা—শুকনা বিদেশী খেজুর

আমি চট করে বললাম : 'কেন, তোমার খোদা কি বড় রাগী।'

সুভান দাদা খুব জোরে হেসে উঠল। আমার মাথায় আবার হাত বোলাতে বোলাতে বলল : 'ছোটদের খুব ভালবাসেন তিনি।—দীর্ঘায়ু করুন তোমায় তিনি!' এই বলে আমায় সে নিজের কাঁধে তুলে নিল। দেওয়ালের কাছে এসে নাবিয়ে দিয়ে চট করে কর্নিক বাসুলী নিয়ে দেওয়ালের ওপর কাজ করতে লাগল।

ভাল রাজমিস্ত্রী বলে সুভান খাঁর নাম ছিল। যখনই বাড়ির কিছু মেরামত করবার দরকার পড়ত তাকেই ডাকা হত। এসে পাঁচ সাত দিন এখানেই থেকে কাজ শেষ করে সে চলে যেত।

লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ দেহ। প্রশস্ত ললাট, ঘন উঁচু ভ্রূ, চোখের কোণ-গুলো লালচে আর তারা দুটোয় নীলের আমেজ। নাকটা অসাধারণ টিকলো। ঘন দাড়ি বুক অবধি পৌঁছেছে, আর বুক সেই বুড়ো বয়সেও চওড়া, ফোলান। মাথায় তার সর্বদা থাকত 'দুপলিয়া'[৩] টুপি আর গায়ে ফতুয়া। পরনে তার ধুতি, পায়ে দেশী জুতো। চেহারার ওপর একটা জ্যোতি, মুখে মধু ঝরত। অভিজাত চালচলন, কথাবার্তায় কেতাদুরস্ত।

কিন্তু এ সবেরও ওপরে তার দাড়ি। ছোটবেলা থেকে তার সাদা ধপধপে দাড়ি আমার বড় ভাল লাগত। নমাজের সময় পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গী, গায়ে সাদা পাঞ্জাবী, হাঁটু গেড়ে, হাত দুটো বুকের ওপরে একটু তুলে, অর্ধ নিমীলিত চোখে যখন সে মন্ত্রের মত কি বলত, আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে তাকে দেখতাম। আমার মনে হত যেন তার আল্লা তার কাছেই এসেছেন, দাদা যেন তাকে প্রত্যক্ষ দেখছে, আর তার ঠোঁট নাড়া কথাবার্তা যেন তাঁর সঙ্গেই হচ্ছে।

---

৩ মাঝখানে সেলাই করা টুপি, লক্ষ্ণৌয়ে বিশেষভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে এ ধরনের টুপি।

একদিন শিশুর আগ্রহ নিয়ে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম : 'সুভান দাদা তুমি কখনও আল্লাকে দেখেছো ?'

'সে কি কথা খোকা—মানুষের চোখে আল্লাকে কখনও দেখা যায় না কি ?'

'আমায় ঠকিও না দাদা, আমি সব দেখেছি। রোজ তুমি অর্ধেক চোখ বুজে তাঁকে দেখো আর ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বল। আমায় কী মনে করেছ যে তুমি ঠকাচ্ছ ?'

'খোকা, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলব! কেবল রসুলের সঙ্গেই তাঁর কথাবার্তা হ'ত। কোরানে সেই সব কথাই তো লেখা আছে।'

'আচ্ছা দাদা—তোমার রসুল সায়েবেরও কি দাড়ি ছিল ?'

'হাঁ হাঁ ছিল। বড় সুন্দর সোনার মত রংএর লম্বা দাড়ি। এখনও তার কয়েকটি চুল মক্কায় রাখা আছে। আমরা তীর্থে গিয়ে সে চুলও দর্শন করে আসি।'

'বড় হলে যখন আমার দাড়ি হবে তখন আমিও দাড়ি রাখব—খুব লম্বা দাড়ি।"

সুভান খাঁ আমায় কোলে তুলে নিল, কাঁধে করে এদিক ওদিক খানিকটা ঘুরিয়ে আনল। অনেক রকম কথা বলল, গল্প শোনাল। আমায় ভুলিয়ে সে আবার নিজের কাজে লেগে গেল। আমার মনে হত কাজ আর আল্লা এই দুই বস্তুই সংসারে প্রিয় ছিল তার। কাজ করবার সময় আল্লার নাম আর ভোলে না—আল্লার কাছে ফুরসৎ পেলে আবার কাজে লেগে যাওয়া সে নিজের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো। কাজ আর আল্লার এই সামঞ্জস্য তার হৃদয়ে প্রেমের মন্দাকিনী প্রবাহিত করত, বোধহয় সেইজন্যই আমার মত শিশুর জন্যও তার হৃদয়ে স্থানাভাব ছিল না।

* * *

দিদিমা বললেন : 'সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে নাও। আজ তোমায় হুসেন সায়েবের পাইক হতে যেতে হবে। সুভান খাঁ এল বলে।'

যে সকল দেবদেবীর মানত করে মা আমাকে পেয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে হুসেন সায়েব অন্যতম! ন বছর বয়স পর্যন্ত—অর্থাৎ যতদিন না পৈতে হয়েছে মহরমের দিন মুসলমান ছেলেদের মত আমাকেও তাজিয়ার চারপাশে রঙ্গীন ছড়ি নিয়ে দৌড়তে হত। গলায় হুসেন সায়েবের 'গণ্ডে'—অর্থাৎ সুতোর তাবিজও পরতে হত। তখন মহরম আমার কাছে যে কি আনন্দের দিনই না ছিল। নতুন কাপড় জামা পরতাম, দৌড় ঝাঁপ করতাম, নতুন নতুন লোক আর নানা রকম খেলা দেখতাম—হৈ চৈ করে কি ভাবেই না চার প্রহর কেটে যেত। এই মহরমের পেছনে যে রোমাঞ্চকারী করুণ ব্যথাভরা কাহিনী লুকিয়ে আছে তার খবর কোথায় ছিল সেদিন?

আমি নেয়ে ধুয়ে কাপড়চোপড় পরে প্রতীক্ষা করছি, অবিলম্বে সুভান খাঁ এসে গেল। এসে আমায় কাঁধে তুলে নিজের গ্রামে নিয়ে গেল।

তার বাড়ি যেন ছোট ছেলেদের আড্ডা হয়ে থাকত। নাতিপুতিতে বাড়ি ভর্তি। আমার বয়সেরই কত ছেলে রঙ্গীন কাপড়ে সেজে গুজে সকলেই যেন আমার প্রতীক্ষা করছে। সুভান দাদার বুড়ি বউ আমার গলায় একটা 'বোদি' [৪] পরিয়ে দিল, কোমরে ঘণ্টা বেঁধে দিল, হাতে দিল দুটো লাল রংএর ছড়ি। তারপর সব ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে কারবালার দিকে রওনা হল। সারা দিন লাফ ঝাঁপ, তামাসা দেখা, মেঠাই খাওয়া—তারপর সন্ধ্যাবেলায় আবার সুভান দাদার কাঁধে চড়ে বাড়ি।

---

৪ মহরমে গলায় পরা হয় রঙ্গীন সুতো। তাবিজ বিশেষ।

ঈদে বকরীদে সুভান দাদা যেমন আমাদের ভুলত না, দোল দেওয়ালীতে আমরাও তেমনি তাদের কখনও বাদ দিতাম না। দোলের দিন দিদিমা নিজের হাতে মালপুয়া, পরমান্ন, মাংস পরিবেশন করে সুভান দাদাকে খাওয়াতেন। আমি আবীর দিয়ে তার দাড়ি রাঙিয়ে দিতাম। একবার তার দাড়ি যখন রঙীন হয়ে গেল আমি বললাম: 'সুভান দাদা রসুলের দাড়িও হয়ত বা এমনই রঙীন ছিল।'

'তার ওপরে তো আল্লা নিজে রঙ লাগিয়ে দিয়েছিলেন খোকা, তাঁর ওপর আল্লার যে খাস মেহেরবাণী ছিল। তাঁর মত অদৃষ্ট আমাদের মত অধম মানুষদের কোথায়?' এই বলে চট করে চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করতে লাগল—যেন ধ্যানে তাঁকে দেখছে।

আমিও কিছু বড় হলাম—ওদিকে দাদাও শেষ পর্যন্ত হজ করে এল। বড় হয়েছিলাম কিন্তু সেই ছোয়াড়ার কথা তো ভুলি নি। ছুটিতে যখন সহরের স্কুল থেকে বাড়ি এলাম দাদা তার সেই অনুপম উপহার নিয়ে এল। এদিকে তার সংসারের অবস্থাও তখন বেশ ভাল, দাদার নিজের পুণ্যে আর উপযুক্ত ছেলেদের রোজগারে বেশ পয়সা হয়েছিল। কিন্তু তার স্বভাবে ও ব্যবহারে তখনও সেই নম্রতা, সজ্জনতা। এসে ঠিক আগের মতই শিষ্টাচারসম্মত কথা হল। তারপর ছোয়াড়া বার করে আমার হাতে দিল। 'খোকাবাবু এ তোমার জন্য খাস আরব থেকে নিয়ে এসেছি। মনে আছে তো—ফরমাশ করেছিলে?' আনন্দে তার ঠোঁট কাঁপছিল।

ছোয়াড়া নিয়ে মাথায় ঠেকালাম। ইচ্ছা হল যদি আবার ছোট হয়ে যেতে পারতাম, তা হলে তার কাঁধে লেপটে গিয়ে তার সাদা দাড়ির মধ্যে—এখন যা সত্যি সত্যি দিব্য জ্যোতির্ময় হয়ে গেছে—আঙুল

দিয়ে 'দাদা' 'দাদা' বলে ডাকতে পারতাম। কিন্তু এখন আর বালক হয়ে যেতেও পারি না, আর শৈশবের সেই সরলতা, সেই পবিত্রতাও এখন আর নেই। ইংরেজী স্কুলের আবহাওয়ায় এক অদ্ভুত রকম অস্বাভাবিকতা প্রত্যেক বিষয়ে এসে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু চোখ দুটোই তখনও পবিত্র রয়ে গিয়েছিল। আমি সেই চোখের জল দিয়ে নিজেকে পবিত্র করে নীরবে তার চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলাম।

* * *

হজ থেকে ফিরে সুভান দাদার বেশীর ভাগ সময় এখন নামাজ ইত্যাদিতেই কাটত। সারা দিন হাতে মালা ফিরত আর মুখে আল্লার নাম। এ অঞ্চলে তার বুদ্ধি বিবেচনার ওপর লোকেদের খুব আস্থা ছিল। বড় বড় ঝগড়া বিবাদের পঞ্চায়েতে, দূর দূর থেকে, হিন্দু মুসলমান, তাকে সালিশ মানত। তার ন্যায়বুদ্ধি ও সততার এমনই প্রভাব ছিল।

সুভান দাদার আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি মসজিদ তৈরি করবার। আমার মামার মন্দির সে-ই তৈরি করেছিল। তখন সে একজন সাধারণ রাজমিস্ত্রী ছিল। তবু তখনই বলত: 'আল্লার ইচ্ছা হলে আমিও একদিন একটা মসজিদ তৈরি করব।'

আল্লার ইচ্ছায় এমন দিন এলও। তার মসজিদ তৈরি হল। গ্রামের পরিবেশের উপযুক্ত ছোট্ট একটি মসজিদ—কিন্তু বড়ই সুন্দর। দাদা তার সারা জীবনের অর্জিত কারু-শিল্প তারই ওপর ঢেলে দিল। নিজের হাতে কর্নিক ধরবার শক্তি আর ছিল না তার, কিন্তু সারা দিন বসে বসে প্রত্যেকটি ইটের জোড়াই দেখত। আর তার মধ্যে যেসব লতাপাতা কাটা হল তার নকশার নমুনা সে-ই দিয়েছিল। তার প্রতিটি রেখা সে নিজের সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে করিয়েছিল।

মামার বাগানে শিশু, সখুয়া, কাঁঠাল গাছ ছিল প্রচুর, এই সব কাঠই বাড়ি তৈরির কাজে লাগে। মসজিদের কাঠও ঐ বাগান থেকেই গিয়েছিল।

যেদিন মসজিদ তৈরি হয়ে গেল সুভান দাদা এ অঞ্চলের সমস্ত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকদের নিমন্ত্রণ করেছিল। জুমার (শুক্রবার) দিন ছিল। যত মুসলমান ছিল সকলে সেইখানে নামাজ পড়ল। যত হিন্দু এসেছিল তাদের জন্য সুভান দাদা হিন্দু হালুইকর এনে নানা রকমের মিষ্টি মেঠাই তৈরি করিয়েছিল, পান এলাচের ব্যবস্থা করেছিল। আজ পর্যন্ত লোকে মসজিদ উদ্ঘাটনের সেই দিনটিতে সুভান দাদার অতিথি আপ্যায়নের কথা ভোলে নি।

* * *

কালের পরিবর্তন হয়েছে। আমি এখন প্রায় সহরেই থাকি। ইদানীং সহর তো হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার আখড়া হয়ে উঠেছে। হাঁ—আজকাল—। দেখছেন একই পথ দিয়ে হিন্দু মুসলমান হাঁটছে, একই দোকানে জিনিসপত্র কিনছে, একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে যাওয়া আসা করছে, একই স্কুলে পড়ছে, এক অফিসেই কাজ করছে—হঠাৎ তাদের মাথায় যেন শয়তান চাপল। হল্লা, দৌড়োদৌড়ি, মারপিট, খুন জখম, আগুন লাগান—নরক একেবারে গুলজার। প্রাণের কোন ঠিক নেই, মান ইজ্জতের, ঘর বাড়ির কোনই নিরাপত্তা নেই। ভ্রাতৃত্ব ও সহৃদয়তার স্থানে ঘৃণা-বিরোধ আর নৃশংস হত্যার উলঙ্গ নৃত্য।

সহর থেকে এ রোগ ক্রমশ গ্রামেও ঢুকল। গোরু আর বাজনা নিয়ে বিবাদ বাধল। যারা সারা জীবন নিজের নিজের গোরুকে কসাই-খানায় বেচেছে হঠাৎ তারা একটি গোরু কাটার কথা শুনে কত মানুষের গলা কাটতে তৈরি। যাদের বিয়ে, পরব উৎসবে বাজনার মহা ধুমধাম,

মহরমের শোকের দিনও বাজনাবাদ্যির ধুম—এখন তারাই মসজিদের সামনে দিয়ে এক মিনিটের জন্য বাজনার দল গেলে রক্তের নদী বইয়ে দিতে বদ্ধপরিকর।

কতকগুলো পণ্ডিত আর মোল্লার পোয়াবারো। সংগঠন আর তাঞ্জিমের নামে কলহের বীজ বপন হতে লাগল। লাঠি উঠল, ছুরি বার হল। কত মাথা ফাটল, কত পেটের অন্ত্র বার হল। কত জোয়ান মরল—কত ঘর উজাড় হয়ে গেল—তার আর ইয়ত্তা নেই। বাকী যে ক্ষেত খামার, তাও ইংরেজী আদালতের খরচের জন্য বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। মুসলমানরা গোরু কোরবানী দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ অঞ্চলে তাদের সংখ্যা অল্প হলে হবে কি—উৎসাহ তাদের প্রবল। এদিকে হিন্দুদের গোরুর ওপর যত না মমতা তার চেয়ে বিশ্বাস আর গর্ব নিজেদের সংখ্যা অধিক বলে। কলহের বাজার গরম।

খবর ছড়াল সুভান খাঁর মসজিদে কোরবানী হবে।

'অাঁ, সুভান খাঁর মসজিদে কোরবানী? না না, তা হতেই পারে না।'

'যদি হয়ই, তা হলে? লোকে আমাদের ছি ছি করবে। বলবে এত হিন্দু আছে তবু গোমাতার গলায় ছুরি চলল?'

'ছুরি থেকে গোমাতাকে বাঁচাতে হয় তো গৌরা গৌরীর কসাই-খানায় চল। আর যদি সত্যাই উৎসাহ থাকে তা হলে চল মজঃফরপুরের গোরা ফৌজের ছাউনি চড়াও করা যাক। কসাইখানায় তো শুধু বুড়ো গোরুগুলোই কাটে কিন্তু ছাউনিতে কেবল মোটা মোটা বাছুর।'

'কিন্তু সে তো আর আমাদের চোখের সামনে হয় না। চোখে দেখে এ কেমন করে সয়?'

'মাপ কর ভাই, কাছে দূরের কথা নয়। কথা হচ্ছে সাহসের,

শক্তির। ছাউনিতে তোমরা যাবে না কারণ সেখানে সোজা তোপের মুখে পড়তে হবে।.... আর এখানে নামমাত্র মুসলমান, তাই তাদের ওপর চড়াও করতে চাও।'

'আপনি তো সুভান খাঁর পক্ষ নিচ্ছেন, বন্ধুত্বের কাজই করছেন। কিন্তু বন্ধুত্ব ধর্মের চেয়ে বড় নয়।'

আমার মামার কথাগুলো কয়েকজন যুবকের এতই মন্দ লাগল যে কয়েকটা কড়া কড়া কথা বলতে বলতে তারা সেখান থেকে উঠে গেল। কিন্তু রাগ যতই হোক, আর চেঁচামেচি যতই করুক, এ কথা সকলেই বুঝত যে মামার সঙ্গে যোগসাজস না করে বেশী কিছু করবার সাহস কারোই নেই।

ওদিকে সুভান দাদার দোরে মুসলমানদের ভিড়। না জানি কোথা হতে দাদার মনে এত জোর এসেছে। সে কড়া সুরে বলছে—

'গোরু কোরবানী হবে না। এ সব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। আমার সামনে থেকে তোমরা যাও।'

'কেন, হবে না কেন? ভয় পেয়ে কি আমরা ধর্ম ত্যাগ করব?'

'আমি বলছি এ ধর্ম নয়। আমি হজ করে এসেছি, কোরান পড়েছি। গোরু কোরবানী অপরিহার্য নয়। আরব দেশে লোকে ছাগল উট এই সব কোরবানী করে।'

'কিন্তু আমরা গোরু কোরবানী করব—এতে ওরা বাধা দেবার কে? আমাদের ধর্মে ওরা হাত দেবে কেন?'

'ওদের কথা ওদের কাছে জিজ্ঞাসা কর। আমি মুসলমান—আল্লার নাম আমি কখনও ভুলি নি। একজন মুসলমান—এই দাবিতে আমি বলছি, গোরু কোরবানী হবে না।'

দাদার দাড়ি কাঁপছে, রাগে মুখখানা লাল, ঠোঁট দুটো কাঁপছে, সারা

দেহ কাঁপছে। তাঁর এ অবস্থা দেখে সকলে চুপ। কেবল একজন যুবক বলে উঠলো—

'আপনি বুড়ো হয়েছেন, এ সমস্ত থেকে দূরে থাকুন। আমরা কাফেরদের দেখে নেব।'

দাদা চেঁচিয়ে বললে: 'কল্লুর বেটা, মুখ সামলে কথা বল্। তুই কাফের বলছিস কাদের?—আর আমার বুড়ো হওয়ার কথা ছাড়। আমি মসজিদে চললাম। আগে আমাকে কোরবানী দেবে তা'পর গোরু—'

সুভান দাদা সেই খচাখচির মধ্যেই মসজিদে গেল, নমাজ পড়ল। তারপর মালা হাতে নিয়ে বসল মসজিদের চৌকাঠের ওপর। বললে: 'ঢুকতে হয়—আমার লাশের ওপর দিয়ে মসজিদে ঢুকবে—এমনিতে নয়।'

চোখ বন্ধ। অজস্র অশ্রুধারা গাল বেয়ে তার সেই সাদা দাড়ি ভিজিয়ে দিচ্ছে। হাতের মালাটা নড়ছে, ঠোঁট দুটো সামান্য কাঁপছে। সেই কাঁপনটুকু ছাড়া তার সর্বাঙ্গ যেন মর্মর মূর্তি—নিশ্চল নিস্পন্দ।

ধীরে ধীরে মসজিদের কাছে লোক জমা হতে লাগল, প্রথমে মুসলমান, তারপর হিন্দু। গোরু কোরবানী দেবার দাবি দাদার চোখের জলে ভেসে না জানি কোথায় চলে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে যেন সাক্ষাৎ দেবদূত।—হাঁ, দেবদূত! তার প্রতি রোম হতে প্রেম আর সৌভ্রাত্রের শুভেষণা সারা বায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

* * *

এই কিছুদিন হল দু বছর জেলে কেটে যাবার পর আমার রাণী দেখা করতে এল। দীর্ঘ-দিন আমার ফিরে আসার পথ চেয়ে অবশেষে গয়া সেণ্ট্রাল জেলেই এল আমার সঙ্গে দেখা করতে।

এত দিন ছাড়াছাড়ির পর দেখা হলে প্রথম যে বস্তুটি সে আমায় দিল—তা হল রেশম সুতোয় জড়ান গণ্ডে, বোদি ইত্যাদি—'এ হল সূর্যদেবতার, এটি অনন্তদেবের, এটি গ্রামদেবতার—' প্রত্যেকটির পরিচয় দিয়ে শেষে একটি দিয়ে বললে : 'এটি হুসেন সায়েবের "গণ্ডে", ধারণ কর, আমার দিব্যি রইল।'

এ সবই আমার মায়ের মানতের অবশেষ চিহ্ন। মা গেছেন, বাবাও গত হয়েছেন, রাণী চারটি সন্তানের জননী হয়েছে, আমি পিতা হয়েছি—কিন্তু তবুও সেই সব মানত এখনও মেনে চলার বিরাম নেই। রাণী জানে যে আমি নাস্তিক। তাই সুবিধা হলেই সে নিজের হাতে এগুলি আমার গলায় পরিয়ে দেয়। আজ এই জেলে জেল কর্মচারী, সি. আই. ডি. পুলিশের সামনে সে নিজের হাতে পরাতে পারল না কিন্তু দিব্যি দিতে ছাড়ল না। তার মন রাখবার জন্য আমিও একটু হাসলাম।

রাণী চলে গেল আর আমি সেই সুতোগুলো অর্থাৎ তাবিজ গণ্ডে ইত্যাদি স্যুটকেসে রেখে দিলাম।

যতবারই স্যুটকেসটা খুলি আর হুসেন সায়েবের 'গণ্ডে'র ওপর নজর পড়ে ততবারই দুটো অপূর্ব ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

প্রথমটি কারবালার ছবি—

একদিকে কেবল বাহাত্তর জন লোক, স্ত্রীলোক, শিশুও তার মধ্যে আছে। এই ছোট দলটির নেতা হজরত হুসেন সাহেব। তাঁকে বার বার কুফার মসনদে বসবার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। কিন্তু সে মসনদ তো দূরের কথা, আজ তাঁর এক আঁজলা জল পাওয়ার পথও বন্ধ! সামনে দিয়ে ফুরাত (ইউফ্রেটিস্) নদী বয়ে চলেছে কিন্তু তার

ঘাটে ঘাটে পাহারা, তাঁকে জল নিতে দেওয়া হচ্ছে না। সর্ত—হয় দুরাচারী, দুরাগ্রহী এজিদকে রাজা বলে মেনে নাও আর না হয় তৃষ্ণায় ছটফট করে মর।

শিশুরা পিপাসায় ছটফট করছে, তাদের জননী আর ভগিনীরা হাহাকার করছে। হায় রে এক আঁজলা জল! আমার বাছার কণ্ঠ শুকিয়ে গেল—শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। জল, জল—এক আঁজলা জল···।

জলভরা নদী সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আর সম্মান ঐশ্বর্য যথেষ্ট মিলবে তোমার—কারণ তুমি যে স্বয়ং রসুলের নাতি।···কিন্তু ঐ একটি সর্ত—এজিদের হস্ত চুম্বন করে তাকে স্বীকার কর।

এজিদের হস্ত চুম্বন? দুরাচারী, দুরাগ্রহী এজিদকে রাজা বলে মেনে নেবে? রসুলের দৌহিত্র···? তা হতে পারে না। তার চেয়ে মরা ভাল, এ নীচ কাজ রসুলের দৌহিত্রের দ্বারা সম্ভব নয়।

কিন্তু শিশুদের জন্য জল যে চাইই। এমন করে ধড়ফড়িয়ে তাদের মরতে দেওয়া যে চলে না··।

একদিকে বাহাত্তর জন মানুষ—স্ত্রী ও শিশু তার মধ্যে আছে—আর অন্যদিকে দুরাচারী এজিদের অসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধ হ'ল, হজরত হুসেন আর তাঁর ছোট দলটি সেই কারবালার ময়দানে শহীদ হয়ে গেলেন। শহীদের রক্তে সাহারার রৌপ্য বালুরাশি রক্তবর্ণ হয়ে গেল, শিশুদের হাহাকার ও অবলার আর্তনাদে সমস্ত বায়ুমণ্ডল কেঁপে উঠছে···।

এমন করুণ কাহিনী সংসারের ইতিহাসে বিরল। মহরম এই দিনটিরই করুণ স্মারক। পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমান এই দিনটি স্মরণ

করে। ভ্রাতৃত্ববন্ধন গড়ে ওঠার পর হিন্দুরাও এটি নিজেদের পর্ব বলে গ্রহণ করেছিল, সব দিক দিয়েই উপযুক্ত হয়েছিল।

অন্য ছবিটি আমার সুভান দাদার—যার কাঁধে চড়ে আমি মহরম দেখতে যেতাম। সেই বিস্তৃত ললাট, সাদা দাড়ি, সেই মমতা মাখান দুটি চোখ, মধু বর্ষণকারী দুটি ঠোঁট—তার সেই দিব্য জ্যোতির্ময় মূর্তি।

তার যৌবনদিনের অর্ধেক সময় আল্লার চিন্তায় আর বাকী অর্ধেক সময় কাজে সমান ভাবে ভাগ করা ছিল। বার্ধক্যের দিনগুলো তার আল্লার চিন্তায় ওতপ্রোত ছিল। তার চিন্তায় মিশে গিয়েছিলেন আল্লা, তার হৃদয়ে প্রেমের ধারাপ্রবাহ। সেই স্নেহবারি সিঞ্চনে আপন পর সকলের হৃদয় জুড়িয়ে যেত।

প্রণাম করবার জন্য আমার মস্তক নত হয়ে যায়। কারবালার শহীদের সামনে মাথা নত করে আমি আমার সুভান দাদাকে প্রণাম করি।

বুধিয়া

একটা ছোট ছাগলছানা লাফিয়ে লাফিয়ে এসে চামেলীর টাটকা কচি কচি পাতাগুলো যথেচ্ছ টেনে টেনে চিবোতে লাগল। তখনও পর্যন্ত আমার মনে এতটা শিল্পদৃষ্টি জাগ্রত হয় নি যে সেই ছোট্ট সুন্দর প্রাণীটির ঐ লাফান, লম্বা লম্বা কান দিয়ে শব্দ করতে করতে পাতা ছিঁড়ে নেওয়া এবং চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে সাবধানে দেখতে দেখতে অবিরাম মুখ চালিয়ে যাওয়া, আবার মাঝে মাঝে নিজের

জননীকে স্মরণ করে 'ম্যাঁ ম্যাঁ' করে চেঁচিয়ে ওঠা দেখে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে থাকি। তখন তো সবচেয়ে অধিক মমতা চামেলী গাছটারই ওপর। গাছটার কলম এনেছিলাম এক দূর গ্রাম থেকে। নিজে পুঁতেছিলাম, জলও দিতাম নিজেই, এবং তার এক একটি কচি পাতা বার হতে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠতাম। ছোট্ট দুষ্টু ছাগল-ছানাটা গাছটার একেবারে সর্বনাশ করে ফেলল। রেগে সেটাকে মারতে দৌড়লাম, সেটা হরিণছানার মত লাফ দিয়ে পালাল, আমি পেছনে পেছনে দৌড়লাম—

'মেরো না বাবু' বুধিয়া বলল। ছোট একটা মেয়ে, সাত আট বছরের বেশী আর কি হবে। কোমরে একরঙা একখানা ন্যাকড়া, শত তালি দেওয়া, কোনরকমে হাঁটু অবধি নেবেছে। সারা দেহে আর কিছু নেই, ধুলো-মলিন। শ্যামলা রং, কালো চুলের গোছা এদিক ওদিক বিশৃঙ্খল হয়ে ছড়িয়ে আছে, চুলে ভর্তি ধুলো এবং উকুনও নিশ্চয় আছে। একটা নাকের ফুটো দিয়ে হলদে পোঁটা বের হচ্ছে, বার বার টানছে সেটাকে। তার কথা শুনে আর তার চেহারা দেখে ইচ্ছা হল এক চড় মারি তার গালে, কিন্তু তার পায়ের কাছে চোখ পড়ায় সেই দিকেই মনটা চলে গেল, আর সব ভুলে গেলাম।

'এই—এগুলো কি রে?' কাছে এসে দেখতে লাগলাম। দেখি কাছের কোন পুকুর থেকে মসৃণ কাদা এনে সে অনেক পুতুল তৈরি করেছে। ক্ষেত থেকে সরষে, ছোলা মটরের ফুল এনে পুতুলগুলো খুব সাজিয়েছে। সেগুলোর গড়ন অবশ্য বিশেষ বোঝা যাচ্ছিল না তবে সেগুলো মানুষের আকৃতি আর রঙ বেরঙের ফুলে সজ্জিত হয়ে দেখাচ্ছিল ভালই। জিজ্ঞাসা করলাম : 'এগুলো কি রে?'

'মারবে না বল। তবে বলব।'

'আজ মারতাম নিশ্চয়, কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি।'

সে মুচ্‌কি হেসে বসে পড়ল। বলল 'বস না' কিন্তু সেই নোংরার মধ্যে বসতে আমার বয়ে গেছে। আমি ঝুঁকে দেখতে লাগলাম। সে বলতে লাগল :

'এ হল বর, টোপর পরেছে'—সরষে ফুলের দিকে দেখিয়ে বলল : 'বাসন্তি মৌর (টোপর)। এ হল কনে, এর কি সুন্দর কাপড়, মটর আর ছোলার ফুলে কেমন দেখাচ্ছে দেখ। আজ এদের বিয়ে। খুব বাজনা হবে'—দু তিনবার নিজের পেটটা বাজিয়ে দেখাল, তার পর শিষ দিল অর্থাৎ ঢোল আর শানাইও বাজবে।

'এটা বাসরঘর' ধুলো দিয়ে চৌকো জায়গা, 'এটা ফুলশয্যা' আমের সবুজ পাতার ওপর কিছু ফুল ছড়ান। 'এতে এরা শোবে আর আমি গান গাইব।'

কিছু গাইতে লাগল গুনগুন করে, দুলে দুলে গান করতে লাগল, আমি দেখলাম ও শুনলাম। ততক্ষণে আবার আমার চামেলীর শোক উথলে উঠল। দৌড়ে গেলাম, এক একটা পাতা গুনে দেখলাম। বড় কষ্ট হল। ইচ্ছে হল ছাগলছানাটাকে জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলি, বুধিয়াকে গালি দিলাম।

* * *

'হুজুর ঘাসের বোঝাটা একটু উঠিয়ে দিন।'

মাথা হেঁট করে অন্যমনস্ক হয়ে নিজের মনেই কত তর্কবিতর্ক করতে করতে আমি গ্রামের উত্তর দিকের রাস্তায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। কথা শুনে মাথা তুললাম।

সন্ধ্যা হব হব। রাস্তার নীচে ক্ষেতে এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। ঘাসের একটা বোঝা তার পায়ের তলায় পাশের দিকে পড়ে আছে।

আমার রাগ হল তার চটুলতা দেখে। এখন আমি সহুরে মানুষ, ফরসা কাপড় পরি, গ্রামের নোংরা লোকেদের কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করি। আমি কি ঘেসুড়ে না গরু-চরানে যে ঘাসের বোঝা তুলব? গ্রামে এত বড় স্পর্ধা কার যে আমায় ঘাসের বোঝা তুলে দিতে বলে? দেখ একবার······

'উঠিয়ে দিন না···'

আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম এবং তার আকৃতি ও কণ্ঠস্বরের সমন্বয় করে দেখলাম। আরে এ যে বুধিয়া! বুধিয়া যুবতী হয়েছে, এত কম সময়ে এত বড় হয়ে গেছে!

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বেচারাকে কে বোঝা তুলে দেয়! দ্রবীভূত হয়ে আমি তার ঘাসের বোঝাটা মাথায় তুলে দিলাম। বোঝা নিয়ে সে কমনীয় ছন্দে চলে গেল।

একটা হাসির শব্দ পেলাম, জগদীশ কাছে এসেছে : 'আপনাকে শেষে ও ধরল!' জগদীশের চোখে দুষ্টুমি, কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গ। তারপর সে আরম্ভ করল 'বুধিয়া-পুরাণ'।

'এখন আর সেই ছেঁড়া কানি পরা বুধিয়া নেই, এখন তার সাড়ীর রঙ কখনও মলিন হয় না। এখন তার জামা সেলাই করে বড় বাজারের দরজী। অবশ্য ঘাস সে রোজই কাটতে আসে কিন্তু তার হাতের বালাটা একটুও ঘসা নয়। রঙ সেই শ্যামলাই আছে, কিন্তু পচা ডোবার জল নয়, কালিন্দীর কলকল ছলছল তরঙ্গ। তার কূলে কত যে কৃষ্ণ বাঁশী বাজায়, কত নন্দলালই যে রাসলীলার স্বপ্নে বিভোর হয়! বুধিয়া যেখান দিয়ে হেঁটে যায় সেখানে জীবনের তরঙ্গ ওঠে। তার চুলে এখন চপচপে করে চামেলীর তেল, কপালে চকচকে টিকলী। বৃন্দাবনে

একটি গোপাল ছিলেন আর সহস্র গোপী। এখানে একটি মাত্র গোপী আর সহস্র গোপাল। এতগুলি গোপালের নাকে একটি দড়ি বেঁধে নাচাতে বুধিয়ার পরম আনন্দ। কালিয় নাগ দমনে বা তার সহস্র ফণার উপর নাচতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এত আনন্দ পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। মনে হয় রাধারাণী এ যুগে বুধিয়ার মারফৎ সমস্ত পুরুষ সমাজের ওপর দ্বাপরের শোধ তুলছেন। তিনি জ্বালা সয়ে গেছেন আর ইনি জ্বালাচ্ছেন!'

ওঃ কি অনর্থ। আমার সভ্য সহুরে মন বিদ্রোহ করে উঠছে। আমি মাথা হেঁট করে অন্ধকারে বাড়ী ফিরছি। জগদীশ অন্য পথে গেছে। গ্রামের কাছাকাছি পৌছতে পৌছতে মনে হল কে যেন আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। আমি পেছন দিকে তাকালাম।

'ক্ষমা করুন বাবু আবার দোষ করে ফেলেছি'—থমকে দাঁড়িয়ে বলল বুধিয়া। রাগে আমার আপাদমস্তক জলে উঠল। 'বদমাইস, খারাপ মেয়ে।'

শুনে লজ্জা সঙ্কোচের নামগন্ধ নেই, সে হো হো করে হেসে উঠল। আমার কাছে এসে বলল।

'মনে আছে বাবু সেই আমার ছাগলছানা চামেলী গাছ খেয়ে ফেলেছিল?'

অন্ধকারেও তার দু পাটি দাঁত ঝকঝক করে উঠল।

'বদমাইস, দূর হ, ভাগ...' নিশ্চয় আমার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল।

'আর সেই বর কনে, বাসর, ফুলশয্যা, সেই গান। গান শুনবেন বাবু?

সজনী চললিহুঁ পিউ ঘর না
জাইতহিঁ লাগু পরম ডর না—"[১]

গাইতে গাইতে সে পালাল, হাসতে হাসতে ললিত ভঙ্গীতে।

ওঃ কি নির্লজ্জ বেহায়া। কত কি যে আমি গালি দিলাম, আর অনেক দূর হতে তার হাসির শব্দ শুনতে লাগলাম।

* * *

ক্ষেতে গম কাটা আরম্ভ হয়েছে। আমার ভাই বলল : 'দাদা আজ অনেক মজুর খাটবে, খুব চুরি করবে। ক্ষেতে যাবে একটু। তোমার কেবল দাঁড়ালেই হবে, কাজ তো সব আপনিই হতে থাকবে।'

আমার রক্তে মাংসে কৃষক বৃত্তির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তারই সঙ্গে একটু নতুনত্ব একটু কৌতূহল মিলে আমায় টেনে নিয়ে গেল ক্ষেতে।

এক প্রহর রাত থাকতে চাঁদের আলোয় গম কাটা হচ্ছিল, যাতে পাকা শিষ থেকে দানা ঝরে না যায়। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আঁটি বাঁধা হচ্ছে। মজুরেরা বাঁধছে, ঝরে পড়া দানাগুলো তাদের বউ ছেলেমেয়েরা নিজেদের জন্যে খুঁটে তুলছে। ঝরা দানা তুলতে আঁটি থেকে যাতে চুরি না করতে পারে তাই আমায় দাঁড়িয়ে দেখবার জন্যে ডাকা হয়েছিল।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। ক্ষেতের এক কোণে এক মজুরের পেছনে একটি আধবয়সী স্ত্রীলোক আর তার কয়েকটি ছেলেমেয়ে খুব দ্রুত দানা তুলছে দেখলাম। মনে হল ব্যাপারটা কিছু সন্দেহজনক।

'এ মাগী কে রে ?—তুই এখানে কি করছিস ?'

আমার চিৎকার সে যেন শুনেও শুনতে পেল না, তার মনে হল তার স্বামী তাকে বকছে।

---

১ 'সখী, প্রিয়তমের ঘরে যাচ্ছি ; যেতে বড় ভয় করছে।'

একবার দুবার তিনবার ডাকলাম। ভ্রূক্ষেপ নেই। অপমানে রেগে আমি সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। আমায় আসতে দেখে তার চারটি ছেলেমেয়ে—ছ বছরের মধ্যেই তাদের বয়স—সেই স্ত্রীলোকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। বছর দেড় বয়সের ছোটটি হামাগুড়ি দিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরল। একটু দূর থেকেই আমি চেঁচিয়ে বকলাম—'এই—কি হচ্ছে?' গম কুড়োতে কুড়োতে নীচু হয়েই সে আমার দিকে ফিরে দেখল। বলল: 'সেলাম বাবু।'

আরে এ কে? বুধিয়া? এ সেই বুধিয়া যে ছেঁড়া কানি পরে থাকত? তারপর যার কাপড়ের রঙ কখনও মলিন হত না? হায় এ কি হয়েছে? তার সেই শৈশব, সেই যৌবন·· আর এখন? হাঁ বুড়ো বয়সই তো। ছেঁড়া কাপড়, গায়ে একটা জামা নেই, রুক্ষ উস্কো-খুস্কো চুল, বসা গাল, কোটরগত চক্ষু। তার যে পীনোন্নত স্তন দুটির গড়নের মহিমায় গ্রামের নবযুবকেরা পাগল হয়ে যেত এখন ঝুঁকে গম কুড়োবার সময় সে দুটি যেন ছাগলীর স্তনের মত ঝুলে পড়েছে—নির্জীব নিস্পন্দ।

'বুধিয়া!'

'হাঁ বাবু।'

মুখটা একবার ফিরিয়ে একটু শুকনো হেসে সে আবার নিজের কাজ করতে লাগল।

তার স্বামীর বোঝা বাঁধা শেষ হয়েছে। সে বুধিয়াকে ডাকল: 'একটু এদিকে আয়, বোঝাটা ধরে দে।'

বুধিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল। আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে একটু হাল্কা হেসে সেদিকে ফিরল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আমি দেখলাম তার পেটটা বড় হয়ে আছে, পা যেন উঠছে না। ও গর্ভবতী। 'তুই থাক, আমি যাচ্ছি'—আমি বললাম।

'না বাবু আপনাকে বোঝা ওঠাতে বলতে পারি না, আপনি আবার রাগ করবেন।' তার সামনের দাঁত দুখানা দেখা গেল, করুণ হাসি।

আমি চমকে উঠলাম। পুরান কথা মনে পড়ে গেল। সেই সন্ধ্যা, সেই ঘাসের বোঝা, বুধিয়ার অনুরোধ, জগদীশের সেই ব্যঙ্গ আর আমার রেগে ওঠা, তার পাগলামী! সব মনে পড়ল। সেই সময় তার ছোট ছেলেটা কেঁদে উঠল। বুধিয়া তার দিকে এগিয়ে গেল আর আমি সোজা তার স্বামীর কাছে গিয়ে বোঝাটা তুলে দিলাম। বেশ মজবুত জোয়ান, বোঝাটা মাথায় নিয়ে সে চলতে লাগল।

এদিকে শিশুর মুখে শুকনো স্তনের বোঁটা দিয়ে, তাকে আদর করে, চুমো খেয়ে, চুপ করিয়ে বুধিয়া বলল :

'আপনার কটি ছেলেমেয়ে বাবু? এরা বড় দুষ্টু। শরীর নষ্ট করেও শান্তি নেই, দিনরাত জ্বালিয়ে মারে বাবু।'

অন্য তিনটি সন্তানও তাকে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল। একজনের গায়ে হাত বুলিয়ে আর একজনের পিঠ চাপড়ে, অন্যটিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে প্রসন্ন করে কোলেরটিকে চাপড়াতে চাপড়াতে সে কত কথাই না বলতে লাগল। আমি একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম। দৃষ্টি তার দি:কে, মস্তিষ্ক নিজের চিন্তায় মগ্ন।

হাঁ বরষা শেষ হ'ল, বন্যা শেষ হল। নদী এবার নিজের ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বন্যাও নেই, হাহাকারও নেই, কাদা বা খড়কুটোর নামও নেই। শান্ত স্নিগ্ধ গঙ্গা।

আমার সামনে মহতী মাতৃত্ব। তার পূজা করি, তাকে বন্দনা করি।